পরও সর্বশেষ ফলাফল এটাই হবে যে, এ ধরনের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করা অসম্ভব। কেননা, ইসলাম ও খৃস্টীয় ইতিহাসে এ সম্পর্কে যা কিছু লিখিত আছে, সেগুলো এত বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী যে, একজন গ্রন্থকার যদি স্বীয় গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ইঙ্গিতের সাহায্যে কোন একদিক নির্দিষ্ট করেন, তবে অন্য জন এমনিভাবে অন্য দিককে অগ্রাধিকার দান করেন।

দীনের হিফাযতের জন্য গুহায় আশ্রয় গ্রহণের ঘটনা বিভিন্ন শহর ও ভূখণ্ডে অনেক সংঘটিত হয়েছে ঃ ইতিহাসবিদদের মতভেদের একটি বড় কারণ এই যে, খৃস্ট-ধর্মে বৈরাগ্যকে ধর্মের সর্বপ্রধান অঙ্গ মনে করে নেওয়া হয়েছিল। ফলে প্রত্যেক ভূখণ্ড ও প্রত্যেক দেশেই এ ধরনের ঘটনাবলী এত বেশি সংঘটিত হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে সারা জীবন সেখানেই কাটিয়ে দিয়েছেন। এখন যেখানে যেখানে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে, সেখানেই আসহাবে কাহ্‌ফের ধারণা হওয়া ইতিহাসবিদদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

আসহাবে কাহ্‌ফের স্থান ও কাল ঃ তফসীরবিদ কুরতুবী আন্দালুসী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এস্থলে কিছু শ্রুত ও কতিপয় চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন শহরের সাথে ঘটনাগুলো সম্পর্কযুক্ত। কুরতুবী সর্বপ্রথম যাহহাকের রিওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, রকীম রোমের একটি শহরের নাম। এর একটি গুহায় একুশ জন লোক শায়িত আছে। মনে হয় তারা যেন ঘুমিয়ে আছে। এরপর তফসীরবিদ ইবনে আতিয়্যা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি অনেক লোকের মুখে শুনেছি, সিরিয়ার একটি গুহায় কিছুসংখ্যক মৃতদেহ আছে। সেখানকার পাণ্ডারা বলে যে, এরাই আসহাবে কাহ্‌ফ। গুহার নিকটে একটি মসজিদ ও একটি গৃহও নির্মিত আছে ঃ একে রকীম বলা হয়। মৃতদেহগুলোর সাথে একটি মৃত কুকুরের কংকালও বিদ্যমান।

দ্বিতীয় ঘটনা আন্দালুস গার্নাতার (স্পেনের গ্রানাডা)। ইবনে আতিয়্যা বলেন ঃ গার্নাতায় 'লাওশা' নামক গ্রামের অদূরে একটি গুহা আছে। একে রকীম বলা হয়। এই গুহায় কয়েকটি মৃতদেহ এবং তাদের সাথে একটি মৃত কুকুরের কংকালও বিদ্যমন আছে। অধিকাংশ মৃতদেহ মাংসবিহীন শুধু অস্থি কংকাল এবং কিছু সংখ্যক মৃতদেহে এখনও মাংস আছে। এভাবে বহু শতাব্দী অতিক্রম হয়েছে, কিন্তু বিশুদ্ধ উপায়ে তাদের কোন অবস্থা জানা যায় না। কিছুসংখ্যক লোক বলে যে, এরাই আসহাবে কাহ্‌ফ। ইবনে আতিয়্যা বলেন ঃ এই সংবাদ শুনে আমি ৫০৪ হিজরীতে সেখানে পৌঁছে দেখি, বাস্তবিকই মৃতদেহগুলো তেমনি অবস্থায়ই পড়ে রয়েছে। তাদের নিকটবর্তী স্থানে একটি মসজিদ ও রোমীয় যুগের একটি গৃহ আছে, যাকে রকীম বলা হয়। মনে হয়, প্রাচীনকালে এটা বিরাট রাজপ্রাসাদ ছিল। তখনও এর কোন কোন প্রাচীরের ধ্বংসা-বশেষ বিদ্যমান ছিল। এটা একটা জনশূন্য জঙ্গলে অবস্থিত ছিল। তিনি আরও বলেন ঃ গার্নাতার উপরিভাগে একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। শহরটি রোমীয় স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। শহরের নাম 'রাকিউস' বলা হয়। আমি এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক আশ্চর্য বস্তু এবং কবর দেখেছি। আন্দালুসের অধিবাসী হয়েও কুরতুবী

এসব ঘটনা বর্ণনা করার পরও এদের কোন একটিকেও আসহাবে কাহ্‌ফ বলতে অপ্রস্তুত। ইবনে আতিয়্যাও চাক্ষুষ দেখা সত্ত্বেও দৃঢ়তার সাথে একথা বলেন না যে, এরাই আসহাবে কাহ্‌ফ। তাঁরা সাধারণ জনশ্রুতি বর্ণনা করেছেন মাত্র। অপর একজন আন্দালুসী তফসীরবিদ আবূ হাইয়্যান সপ্তম শতাব্দীতে (৬৫৪ হিজরীতে) গার্নাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই বসবাস করেন। তিনিও তফসীর বাহ্‌রে-মুহীতে গার্নাতার এই গুহার প্রসঙ্গ কুরতুবীর ন্যায়ই উল্লেখ করেছেন। তিনিও ইবনে আতিয়্যার চাক্ষুষ দেখার কথা বর্ণনা করার পর লিখেছেন ঃ আমি যখন আন্দালুসে (অর্থাৎ কায়রোতে পুনর্বাসিত হওয়ার পূর্বে) ছিলাম তখন অনেক মানুষ এই গুহাটি দেখার জন্য গমন করত। তারা বলত যে, যদিও মৃতদেহগুলো এখন পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে এবং দর্শকরা এগুলো গণনাও করে, কিন্তু সর্বদাই তারা সংখ্যা বর্ণনায় ভুল করে। তিনি আরও লিখেছেন ঃ ইবনে আতিয়্যা যে রাকিউস শহরের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি গার্নাতার কেবলার দিকে অবস্থিত। আমি নিজে এই শহরে বহুবার গিয়েছি এবং তাতে বিরাট বিরাট অসাধারণ পাথর দেখতে পেয়েছি। অতঃপর আবূ হাইয়্যান লিখেছেন ঃ

ويترجح كون اهل الكهف باالاندلس لكثرة دين النصارى بها حتى هى بلاد مملكتهم العظمى .

অর্থাৎ যে কারণে আসহাবে কাহ্‌ফের আন্দালুসে অবস্থিত হওয়া সম্পর্কে প্রবল ধারণা জন্মে, তা এই যে, সেখানে খৃস্টধর্মের চর্চা প্রবল। এমনকি, এটাই তাদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় কেন্দ্র। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আবূ হাইয়্যানের মতে আসহাবে কাহ্‌ফের আন্দালুসে অবস্থিত হওয়াই অগ্রগণ্য।---(তফসীর কুরতুবী, নবম খণ্ড, ৩৫৬ পৃঃ)

তফসীরবিদ ইবনে জরীর ও ইবনে আবী হাতেম উভয়ই আউফীর রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রকীম একটি উপত্যকার নাম, যা ফিলিস্তীনের পাদদেশে আয়লার (আকাবা) অদূরে অবস্থিত। ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম এবং আরও কয়েকজন হাদীসবিদ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রকীম কি, আমার জানা নেই, কিন্তু কা'ব আহবারকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন যে, রকীম ঐ জনপদকে বলা হয়, যাতে আসহাব কাহ্‌ফ গুহায় আশ্রয় গ্রহণের পূর্বে বসবাস করত।---(রূহুল-আ'আনী)

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাসের উক্তি বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে রোমীয়দের মুকাবেলায় একটি জিহাদে অংশগ্রহণ করি, যাকে 'গাযওয়াতুল মুযীক' বলা হয়। এ সময় আমরা কোরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্‌ফের গুহার নিকট উপস্থিত হই। হযরত মুয়াবিয়া গুহার ভিতরে প্রবেশ করে আসহাবে কাহ্‌ফের মৃতদেহগুলো প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস বাধা দিয়ে বললেন ঃ এরূপ করা ঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও তাঁদের মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি তো আপনার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনে বলেছেন ঃ

لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا অর্থাৎ

আপনি তাদেরকে দেখলে পলায়ন করবেন এবং ভয়-ভীতিতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আব্বাসের বাধা মানলেন না। সম্ভবত এ কারণে যে, কোরআনে তাঁদের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা তাঁদের জীবদ্দশায় ছিল। এখনও তাঁদের সে অবস্থা থাকা জরুরী নয়। হযরত মুয়াবিয়া কয়েকজন লোককে দেখার জন্য প্রেরণ করলেন। তারা গুহায় পৌঁছে যখন ভিতরে প্রবেশ করতে চাইল, তখন একটি দমকা হাওয়া এসে তাদেরকে গুহা থেকে বের করে দিল।---(রূহুল-মা'আনী ৫ম খণ্ড, ২২৭)

তফসীরবিদদের উল্লিখিত রেওয়ায়েত ও উক্তি মোটামুটিভাবে আসহাবে কাহ্‌ফের তিনটি স্থান নির্দেশ করে। এক. পারস্য উপসাগরের উপকূলীয় শহর আকাবার (আয়লা) নিকটবর্তী স্থান। হযরত ইবনে আব্বাসের অধিকাংশ রেওয়ায়েত এরই সমর্থন করে।

দুই. ইবনে আতিয়্যার দেখা ও আবূ হাইয়্যানের সমর্থন দ্বারা এ ধারণা প্রবল হয় যে, এই গুহাটি গার্নাতা আন্দালুসে অবস্থিত। এ দু'টি স্থানের মধ্য থেকে আকাবার একটি শহর অথবা কোন বিশেষ দালান-কোঠার নাম রকীম হওয়াও বর্ণিত আছে। এমনিভাবে গার্নাতায় গুহা সংলগ্ন বিরাট ভগ্ন প্রাচীরের নাম রকীম বলা হয়েছে। উপরোক্ত উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে কেউই এরূপ অকাট্য ফয়সালা গ্রহণ করেননি যে, এটাই আসহাবে কাহ্‌ফের গুহা। বরং উভয় প্রকার রেওয়ায়েত স্থানীয় জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীর উপর ভিত্তিশীল।

তিন. কুরতুবী, আবূ হাইয়্যান, ইবনে জরীর ইত্যাদি প্রায় সকল তফসীর গ্রন্থের রেওয়ায়েতে আসহাবে কাহ্‌ফ যে শহরে বাস করতেন, তার প্রাচীন নাম 'আফসূস' এবং ইসলামী নাম 'তরসূস' বলা হয়েছে। এ শহরটি যে এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত, এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের মধ্যে দ্বিমত নেই। এতে বোঝা যায় যে, এ গুহাটিও এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। কাজেই এর কোন একটিকে অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ এবং বাকীগুলোকে ভ্রান্ত বলার কোন প্রমাণ নেই। তিনটি স্থানেরই সমান সম্ভাবনা রয়েছে। বরং এ সম্ভাবনাও কেউ নাকচ করতে পারে না যে, এসব গুহার ঘটনাবলী নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও এগুলো কোরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্‌ফের গুহা নাও হতে পারে এবং সে গুহাটি অন্য কোথাও অবস্থিত থাকতে পারে। আর এটাও জরুরী নয় যে, এখানে রকীম কোন শহর অথবা প্রাচীরেরই নাম হবে, বরং এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, রকীম ঐ ফলকের নাম, যার মধ্যে কোন বাদশাহ্ আসহাবে কাহ্‌ফের নাম খোদিত করে গুহার মুখে টাঙ্গিয়ে রেখেছিল।

আধুনিক ইতিহাসবিদদের গবেষণা ঃ আধুনিক যুগের কোন কোন ইতিহাসবিদ ও আলিম খৃস্টান ইতিহাস এবং ইউরোপীয় ইতিহাসের সাহায্যে আসহাবে কাহ্‌ফের গুহার স্থান ও কাল নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট আলোচনা ও গবেষণা করেছেন।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ আয়লার (আকাবা) নিকটবর্তী বর্তমান শহর পাট্রাকে প্রাচীন শহর রকীম সাব্যস্ত করেছেন। আরব ইতিহাসবিদরা এর নাম লেখেন 'বাত্রা'। তিনি বর্তমান ইতিহাস থেকে এর নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে গুহার চিহ্নও বর্ণনা করেছেন, যার সাথে মসজিদ নির্মাণের লক্ষণাদিও দেখা যায়। এর সমর্থনে তিনি লিখেছেন ঃ বাইবেলের ইশীয় গ্রন্থের অধ্যায় ১৮, আয়াত ২৭-এ যে জায়গাকে 'রকম' অথবা 'রাকেম' বলা হয়েছে, একেই বর্তমানে পাট্রা বলা হয়। কিন্তু এ বর্ণনায় সন্দেহ করা হয়েছে যে, ইশীয় গ্রন্থে বনী ইবনে ইয়ামীনের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পর্কে যে 'রকম' অথবা 'রাকেমের' উল্লেখ আছে, সেটা জর্দান নদী ও লূত সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এখানে পাট্রা শহর অবস্থিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এজন্য বর্তমান যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা এ বর্ণনা মেনে নিতে ঘোর আপত্তি করেছেন যে, পাট্রা ও রাকেম একই শহর। (এনসাইক্লো পেডিয়া ব্রিটানিকা, মুদ্রণ ১৯৪৬, সপ্তদশ খণ্ড ৬৫৮ পৃঃ)

অধিকাংশ তফসীরবিদ 'আফসূস' নগরীকে আসহাবে কাহ্ফের স্থান সাব্যস্ত করেছেন। এটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত রোমকদের সর্ববৃহৎ নগরী ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান তুরস্কের ইজমীর (স্মার্ণা) শহর থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দক্ষিণে পাওয়া যায়।

হযরত মওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভীও 'আরদুল কোরআন' গ্রন্থে পাট্রা শহরের নাম উল্লেখ করে বন্ধনীর ভেতরে রকীম লিখেছেন। কিন্তু এর কোন প্রমাণ তিনি পেশ করেননি যে, পাট্রা শহরের পুরোনো নাম রকীম ছিল। মওলানা হিফযুর রহমান 'কাসাসুল কোরআনে' একেই গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রমাণস্বরূপ তাওরাত ও 'সহীফা সুইয়ার' বরাত দিয়ে পাট্রা শহরের নাম রাকেমা বর্ণনা করেছেন।---(দায়েরাতুল মাআরিফ, আরব থেকে গৃহীত)

জর্দানে আম্মানের নিকটবর্তী এক শ্মাশানভূমিতে একটি গুহার সন্ধান পাওয়া গেলে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৬৩ ইং সনে সে স্থানটি খননের কাজ আরম্ভ করে। মাটি ও প্রস্তর সরানোর পর অস্থি ও প্রস্তরে পূর্ণ ছয়টি শবাধার ও দু'টি সমাধি আবিষ্কৃত হয়। গুহার দক্ষিণ দিকে পাথরে খোদিত বাইজিন্টিনীয় ভাষায় লিখিত কিছু নকশাও আবিষ্কৃত হয়। স্থানীয় লোকদের ধারণা এই যে, এ স্থানটিই রকীম এবং এর পাশে আসহাবে কাহ্ফের এই গুহা।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ) বয়ানুল-কোরআনে তফসীরে হক্কানীর বরাত দিয়ে আসহাবে কাহ্ফের স্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধৃত করে লেখেন ঃ যে অত্যাচারী বাদশাহ্র ভয়ে পালিয়ে গিয়ে আসহাবে কাহ্ফ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার সময়কাল ছিল ২৫০ খৃস্টাব্দ। এরপর তিন শ বছর পর্যন্ত তাঁরা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকেন। ফলে ৫৫০ খৃস্টাব্দে তাঁদের জাগ্রত হওয়ার ঘটনা ঘটে। রসূলুল্লাহ্ (সা) ৫৭০ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্মের ২০ বছর পূর্ব আসহাবে কাহ্ফ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হন। তফসীরে-হক্কানীতেও তাঁদের স্থান 'আফসূস' অথবা 'তরতূস'

শহর সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। বর্তমানেও এর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে। والله اعلم بحقيقة الحال

এসব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য, প্রাচীন তফসীরবিদগণের রেওয়ায়েত ও আধুনিক ইতিহাসবিদদের বর্ণনা থেকে পেশ করা হল। আমি পূর্বেই আরয করেছিলাম যে, কোরআনের কোন আয়াত বোঝা এসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয় এবং যে উদ্দেশ্যে কোরআন এ কাহিনী বর্ণনা করেছে, তার কোন জরুরী অংশ এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত নয়। রেওয়ায়েত ও বর্ণনা এবং এগুলোর ইঙ্গিতাদিও এত বিভিন্নমুখী যে, সমগ্র গবেষণা এবং অধ্যবসায়ের পরও কোনরূপ চূড়ান্ত ফয়সালা সম্ভবপর নয়, কিন্তু আজকাল শিক্ষিত মহলে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি যে অসাধারণ ঝোঁক পরিদৃষ্ট হয়, তার পরিতৃপ্তির জন্য এসব তথ্য উদ্ধৃত করা হল। এগুলো থেকে আনুমানিকভাবে এতটুকু জানা যায় যে, এ ঘটনাটি হযরত ঈসা (আ)-এর পর এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যমানার কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত হয়। অধিকাংশ রেওয়ায়েত এ বিষয়ে একমত। দেখা যায় যে, ঘটনাটি আফসূস অথবা তরতূস শহরের নিকটে ঘটেছে। والله اعلم সত্য এই যে, এসব গবেষণার পরও আমরা সেখানেই দণ্ডায়মান আছি, যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিলাম, অর্থাৎ স্থান নির্ধারণের না কোন প্রয়োজন আছে এবং না কোন নিশ্চিত উপায়ে এটা করা সম্ভব। তফসীরবিদ ইবনে-কাসীর এ কথাই বলেছেন ঃ

قد اخبرنا الله تعالى بذالك وارادمنا فهمه وتدبره ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف فى اى البلاد من الارض اذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعى -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে আসহাবে কাহফের কোরআনে বর্ণিত অবস্থা-সমূহের সংবাদ দিয়েছেন, যাতে আমরা এগুলো বুঝি এবং চিন্তাভাবনা করি। তিনি এ বিষয়ের সংবাদ দেননি যে, গুহাটি কোন্ জায়গায় এবং কোন্ শহরে অবস্থিত। কারণ, এর মধ্যে আমাদের কোন উপকার নিহিত নেই এবং শরীয়তের কোন উদ্দেশ্যও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়---(ইবনে-কাসীর, ৩য় খণ্ড ৭৫ পৃঃ)

আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনা কখন ঘটে এবং গুহায় আশ্রয় নেয়ার কারণ কি ছিল? কাহিনীর এ অংশের উপরও কোরআনের কোন আয়াত বোঝা মওকুফ নয় এবং কাহিনীর উদ্দেশ্যের উপরও এর বিশেষ কোন প্রভাব নেই। তাই কোরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে কোন বর্ণনা নেই। এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বর্ণনাই একমাত্র সম্বল। এ কারণেই আবূ হাইয়্যান তফসীর বাহরে-মুহীতে বলেন ঃ

والروا ة مختلفون فى قصصهم وكيف كان اجتماعهم وخروجهم ولم يات فى الحديث الصحيح كيفية ذالك ولا فى القران

তাদের কাহিনী সম্পর্কে বর্ণনাকারীদের মধ্যে বিস্তর মতবিরোধ রয়েছে। এ ব্যাপারেও মতানৈক্য আছে যে, তারা কিভাবে সর্বসম্মত কর্মপন্থা গ্রহণ করল এবং কিভাবে বের হল? কোন সহীহ্ হাদীসে এসব অবস্থা বর্ণিত হয়নি এবং কোরআনেও না।---(বাহ্রে-মুহীত ষষ্ঠ খণ্ড, ১০১ পৃঃ)

সবার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য উপরে যেমন আসহাবে কাহ্ফের স্থান সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে, তেমনি তাদের কাল এবং ঘটনার কারণ সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত তথ্য তফসীর ও ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত থেকে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে, কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহ) তফসীর মাযহারীতে এ কাহিনীটি বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এখানে শুধু ঐ সংক্ষিপ্ত ঘটনাই লেখা হচ্ছে, যা ইবনে-কাসীর অনেক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তফসীরবিদদের বরাত দিয়ে পেশ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

আসহাবে কাহ্ফ রাজ বংশের সন্তান এবং কওমের সরদার ছিলেন। কওম মূর্তি-পূজারি ছিল। শহরের বাইরে তাদের একটি বার্ষিক মেলা বসত। সেখানে তারা প্রতিমা পূজা করত এবং জন্তু-জানোয়ার কোরবানি দিত। দাক্কিয়ানুস নামে তাদের একজন অত্যাচারী বাদশাহ্ ছিল। সে কওমকে মূর্তিপূজায় বাধ্য করত। একবার যখন সমগ্র জাতি মেলায় সমবেত হল, তখন আসহাবে কাহ্ফের যুবকরাও সেখানে উপস্থিত হল। তারা কওমকে নিজেদের গড়া মূর্তিকে খোদা মনে করতে, তাদের ইবাদত করতে এবং তাদের জন্য কোরবানী করতে দেখল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দান করলেন। ফলে কওমের নির্বোধসুলভ কাণ্ডকারখানার প্রতি তাদের ঘৃণা দেখা দিল। তারা বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে বুঝে ফেললেন যে, এই ইবাদত একমাত্র সে সত্তার জন্য হওয়া উচিত, যিনি আসমান, যমীন ও সমগ্র জগত সৃষ্টি করেছেন। এই ধারণা একই সময়ে যুবকদের মনে জাগ্রত হল এবং তাদের প্রত্যেকেই কওমের নির্বোধসুলভ ইবাদত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সেখান থেকে প্রস্থান করতে লাগলেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম একজন যুবক সমাবেশ থেকে দূরে একটি বৃক্ষের নিচে গিয়ে বসে পড়ল। এরপর দ্বিতীয় একজন এল এবং সেও সে বৃক্ষের নিচে বসে পড়ল। এমনিভাবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ব্যক্তি আসতে লাগল এবং বৃক্ষের নিচে বসতে লাগল। কিন্তু তাদের একজন অপর-জনকে চিনত না এবং এখানে আসার উদ্দেশ্যও জানত না। প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে এখানে সে শক্তি একত্রিত করেছিল, যা তাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করেছিল।

জাতীয়তা সংঘবদ্ধতার আসল ভিত্তি ঃ এই বর্ণনার পর ইবনে-কাসীর বলেন ঃ মানুষ জাতীয়তাবাদকে পারস্পরিক সংঘবদ্ধতার কারণ মনে করে। কিন্তু প্রকৃত সত্য সহীহ্ বুখারীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ঐক্য ও অনৈক্য প্রথমে আত্মাসমূহের মধ্যে সৃষ্টি হয়। এর প্রতিক্রিয়া এ জগতের দেহে প্রতিফলিত হয়। আদিকালে যেসব আত্মার মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য পয়দা হয়েছে, তারা এ জগতেও পরস্পরে গ্রথিত ও এক দলে পরিণত হয় এবং যাদের মধ্যে এই সম্প্রীতি ও পারস্পরিক ঐক্য না থাকে; বরং সেখানে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, তাহলে তাদের মধ্যে এখানেও বিচ্ছিন্নতা থাকবে। আলোচ্য

ঘটনাই এর দৃষ্টান্ত। কিভাবে পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মনে একই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে! এ ধারণাই তাদের সবাইকে আস্তে আস্তে এক জায়গায় একত্র করে দিয়েছে।

মোটকথা, তারা এক জায়গায় একত্রিত হয়ে গেলেও প্রত্যেকেই নিজের বিশ্বাসকে অপরের কাছ থেকে গোপন করছিল। কারণ, সে যদি বাদশাহ্‌র কানে খবর পৌঁছে দেয়, তবে আর রক্ষা নেই ---গ্রেফতার হতে হবে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর এক ব্যক্তি বলল ঃ ভাই, আমরা সবাই যে কওমের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে পৌঁছেছি এর কোন কারণ তো অবশ্যই আছে। কাজেই আমাদের একে অপরের ধারণা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যাওয়াই সমীচীন। এতে এক ব্যক্তি বলে উঠল ঃ সত্য বলতে কি, আমি আমার কওমকে যে ধর্ম ও যে ইবাদতে লিপ্ত পেয়েছি, আমার বিশ্বাস, তা সম্পূর্ণ বাতিল। ইবাদত তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই হওয়া উচিত, জগত সৃষ্টিতে যাঁর কোন অংশীদার নেই। একথা শুনে অন্যেরাও সুযোগ পেয়ে গেল। তাদের প্রত্যেকেই স্বীকার করল যে, এ বিশ্বাসই তাদেরকে কওমের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এখানে পৌঁছে দিয়েছে।

এখানে এই সমমনা দলটি একে অপরের সঙ্গী ও বন্ধু হয়ে গেল। তারা পৃথকভাবে নিজেদের একটি উপাসনালয় নির্মাণ করল এবং একত্রিত হয়ে তারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করতে লাগল।

কিন্তু আস্তে আস্তে তাদের কথা শহরে ছড়িয়ে পড়ল এবং গুপ্তচররা তাদের সংবাদ বাদশাহ্‌র কানে পৌঁছে দিল। বাদশাহ তাদেরকে দরবারে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলে তারা দরবারে হাজির হল। বাদশাহ্ তাদেরকে তাদের বিশ্বাস ও তরীকা সম্পর্কে প্রশ্ন করল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সাহস দান করলেন। তারা নির্ভয়ে তওহীদের বিশ্বাস ব্যক্ত করে দিল এবং স্বয়ং বাদশাহ্‌কেও এর প্রতি দাওয়াত দিল। কোরআনের আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ـ

আমি তাদের চিত্তকে দৃঢ় করে দিলাম, তারা যখন উত্থিত হলো। অতঃপর তারা বলল ঃ আমাদের পালনকর্তা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। আমরা কখনও তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করব না। করলে তা অত্যন্ত গর্হিত হবে।

তারা যখন নির্ভয়ে বাদশাহ্‌কে ঈমানের দাওয়াত দিল, তখন বাদশাহ্ অস্বীকার করল এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করল। অতঃপর তাদের দেহ থেকে রাজপুত্রের আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক খুলে নিল। বাদশাহ্ তাদেরকে চিন্তা-ভাবনার জন্য কিছু দিনের সময় দিয়ে বলল ঃ তোমরা যুবক। আমি তোমাদেরকে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি হত্যা করতে চাই না। এখনও যদি তোমরা স্বজাতির ধর্মে ফিরে আস, তবে তোমাদের মর্যাদা পুনর্বহাল করে দেওয়া হবে, নতুবা তোমাদেরকে হত্যা করা হবে।

মু'মিন বান্দাদের উপর এটা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানী ও কৃপা। এ অবকাশ তাদের জন্য পলায়নের পথ খুলে দিল। তারা সেখান থেকে পলায়ন করে গুহায় আত্মগোপন করল।

তফসীরবিদদের সাধারণ রেওয়ায়েত মতে তারা খৃস্টধর্মের অনুসারী ছিল। ইবনে-কাসীর ও অন্যান্য তফসীরবিদ একথা উল্লেখ করেছেন। তবে ইবনে-কাসীর এ যুক্তির ভিত্তিতে এর সাথে একমত হননি যে, তারা খৃস্টধর্মের অনুসারী হলে মদীনার ইহুদীরা তাদের প্রতি শত্রুতাবশত তাদের ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করত না এবং তাদের কোন গুরুত্ব দিত না। কিন্তু এটা এমন কোন ভিত্তিই নয় যার কারণে সবগুলো রেওয়ায়েত নাকচ করে দেওয়া যেতে পারে। মদীনার ইহুদীরা শুধু একটি আশ্চর্য ঘটনা হওয়ার কারণেই এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল ; যেমন যুলকারনাইন সম্পর্কিত প্রশ্নও এ কারণেই ছিল। এ ধরনের প্রশ্নে খৃস্টত্ব ও ইহুদীত্বের সাম্প্রদায়িকতা মাঝখানে না আসাই সুস্পষ্ট।

তফসীর মাযহারীতে ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত দৃষ্টে তাদেরকে একত্ববাদী গণ্য করা হয়েছে। খৃস্টধর্ম বিলুপ্ত হওয়ার পর গুনাগুনতি যে কয়েকজন সত্যপন্থী জীবিত ছিল, তারা তাদেরই অন্যতম ছিল। তারা বিশুদ্ধ খৃস্টধর্ম এবং একত্ববাদে বিশ্বাস করত। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতেও অত্যাচারী বাদশাহ্র নাম দাকিয়ানূস উল্লেখ করা হয়েছে এবং গুহায় আত্মগোপনের পূর্বে যুবকরা যে শহরে বাস করত, তার নাম আফসূস বলা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতেও ঘটনাটি এমনিভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বাদশাহ্র নাম দাকিয়ানূস বলা হয়েছে। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, আসহাবে কাহ্ফের জাগ্রত হওয়ার সময় দেশের উপর যেসব খৃস্টধর্মের অনুসারী লোকের আধিপত্য কায়েম ছিল, তাদের বাদশাহ্র নাম ছিল বায়দুসীস।

সব রেওয়ায়েতদৃষ্টে প্রবল ধারণার পর্যায়ে একথা প্রমাণিত হয় যে, আসহাবে কাহ্ফ খৃস্টধর্মের অনুসারী ছিল। তাদের সময়কাল খৃস্টজন্মের পর এবং যে মুশরিক বাদশাহ্র কাছ থেকে তারা পলায়ন করেছিল, তার নাম ছিল দাকিয়ানূস। তিন শত নয় বছর পর জাগ্রত হওয়ার সময় যে ঈমানদার ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্র রাজত্ব ছিল, ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে তার নাম 'বায়দুসীস' বলা হয়েছে। এর সাথে বর্তমান যুগের ইতিহাস মিলিয়ে দেখলে আনুমানিকভাবে তাদের সময়কাল নির্দিষ্ট হতে পারে। এর বেশি নির্ণয়ের প্রয়োজনও নেই এবং এর উপায়ও নেই।

আসহাবে কাহ্ফ এখনও জীবিত আছে কি? এ সম্পর্কে এটাই বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট যে, তাদের ওফাত হয়ে গেছে। তফসীর মাযহারীতে ইবনে ইসহাকের বিস্তারিত রেওয়ায়েত রয়েছে যে, আসহাবে কাহ্ফের জাগরণ, শহরে আশ্চর্য ঘটনার জানাজানি এবং বাদশাহ্ বায়দুসীসের কাছে পৌঁছে সাক্ষাতের পর আসহাবে কাহ্ফ বাদশাহ্র কাছে বিদায় প্রার্থনা করে। বিদায়ী সালামের সাথে তারা বাদশাহ্র জন্য দোয়া করে। বাদশাহ্র উপস্থিতিতেই তারা নিজেদের শয়নস্থলে গিয়ে শয়ন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তখনই তাদেরকে মৃত্যুদান করেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি ইবনে-জরীর ও ইবনে-কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদ উল্লেখ করেছেন ঃ

قال قتادة غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة فمروا بكهف في بلاد الروم فرأوا فيه عظاما فقال قائل هذه عظام اهل الكهف فقال ابن عباس فقد بليت عظامهم من اكثر من ثلاث مأة سنة -

কাতাদাহ্ বলেন ঃ হযরত ইবনে আব্বাস হাবীব ইবনে মাসলামার সাথে এক জিহাদ করেন। রোম দেশে একটি গুহার কাছ দিয়ে যাবার সময় তাঁরা সেখানে মৃতলোকদের হাড় দেখতে পান। এক ব্যক্তি বলল ঃ এগুলো আসহাবে কাহ্‌ফের হাড়। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন ঃ তাদের হাড় তো তিনশ বছর পূর্বে মৃত্তিকায় পর্যবসিত হয়ে গেছে।

কাহিনীর এসব অংশ কোরআনে নেই এবং হাদীসেও বর্ণিত হয়নি। ঘটনার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা কোরআনের কোন আয়াত বোঝাও এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতদৃষ্টে এসব বিষয়ের কোন অকাট্য ফয়সালা করা সম্ভবপর নয়। কাহিনীর যেসব অংশ কোরআন স্বয়ং উল্লেখ করেছে, সেগুলোর বিবরণ আয়াতের নিম্নে উল্লেখ করা হবে।

এ পর্যন্ত কোরআন পাক সংক্ষেপে কাহিনী উল্লেখ করেছে। অতঃপর বিস্তারিত বর্ণনা আসছে।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ۭ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ
وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ۝ وَّرَبَطْنَا عَلٰي قُلُوْبِهِمْ ۘ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا
رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ
اِذًا شَطَطًا ۝ هٰٓؤُلَاۗءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ۭ لَوْلَا
يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۢ بَيِّنٍ ۭ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَي اللّٰهِ
كَذِبًا ۝ وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗٓا اِلَى
الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ
اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ۝

(১৩) আপনার কাছে তাদের ইতিবৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। (১৪) আমি তাদের মন দৃঢ় করে-ছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছিল। অতঃপর তারা বলল ঃ আমাদের পালনকর্তা আসমান ও যমীনের পালনকর্তা; আমরা কখনও তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করব না। যদি করি, তবে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে। (১৫) এরা আমা-দেরই স্বজাতি, এরা তাঁর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। তারা এদের সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তার চাইতে অধিক গোনাহ্গার আর কে? (১৬) তোমরা যখন তাদের থেকে পৃথক হলে এবং তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আপনার কাছে তাদের ঘটনা সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। (এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এর বিপরীতে যা কিছু দুনিয়াতে প্রসিদ্ধ রয়েছে, তা সঠিক নয়।) তারা (আসহাবে কাহ্ফ) ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি (সে যুগের খৃস্টধর্ম অনুযায়ী) বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের হিদায়েতে আরও উন্নতি দান করেছিলাম (অর্থাৎ ঈমানের গুণাবলী, দৃঢ়তা, বিপদাপদে সবর, সংসার বিমুখতা, পরকালের চিন্তা ইত্যাদিও দান করেছিলাম। ঈমানের গুণাবলীর মধ্যে একটি ছিল এই যে,) আমি তাদের চিত্ত মজবুত করেছিলাম যখন তারা দৃঢ় হয়ে (পরস্পরে কিংবা বিরুদ্ধবাদী বাদশাহ্র সামনা সামনি) বলতে লাগল ঃ আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। আমরা তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করব না। (কেননা, খোদা না করুন, যদি এরূপ করি) তাহলে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে। এরা আমাদেরই স্বজাতি; তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে। (কেননা তাদের কওম ও সমসাময়িক বাদশাহ্ সবাই মূর্তিপূজারি ছিল।) অতএব তারা স্বীয় (উপাস্য হওয়া) সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? (যেমন একত্ববাদীরা একত্ববাদ সম্পর্কে প্রকাশ্য ও নিশ্চিত প্রমাণের অধিকারী।) তার চাইতে অধিক দুষ্কর্মী আর কে হবে, যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রচনা করে (যে তাঁর কিছুসংখ্যক সমতুল্য ও অংশীদারও রয়েছে)? এবং (তারা পরস্পরে বলল ঃ) তোমরা যখন তাদের থেকে (বিশ্বাসেই) পৃথক হয়েছ এবং তাদের উপাস্যদের (ইবাদত) থেকেও (পৃথক হয়ে গেছ) কিন্তু আল্লাহ্ থেকে (পৃথক হয়নি; বরং তাঁর কারণে সবকিছু ত্যাগ করেছ) তখন (সমীচীন এই যে,) তোমরা (অমুক) গুহায় (যা পরামর্শক্রমে স্থির হয়ে থাকবে) আশ্রয় গ্রহণ কর (যাতে নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে আল্লাহ্র ইবাদত করতে পারে)। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি স্বীয় রহমত বিস্তার করবেন এবং তোমাদের

কাজকর্মে সাফল্যের ব্যবস্থা করে দেবেন। (আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এই আশা নিয়ে) গুহায় যাওয়ার সময় তারা সর্বপ্রথম এই দোয়া করে ঃ

رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ○

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَتًى—اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ-এর বহুবচন فِتْيَةٌ অর্থ যুবক। তফসীরবিদগণ লিখেছেন, এ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, কর্ম সংশোধন, চরিত্র গঠন এবং হিদায়েত লাভের উপযুক্ত সময় হচ্ছে যৌবনকাল। বৃদ্ধ বয়সে পূর্ববর্তী কর্ম ও চরিত্র এত শক্তভাবে শেকড় গেড়ে বসে যে, যতই এর বিপরীত সত্য পরিস্ফুট হোক না কেন, তা থেকে বের হয়ে আসা দুরূহ হয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন যুবক।---(ইবনে-কাসীর, আবূ হাইয়্যান)

وَرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ইবনে-কাসীরের বরাত দিয়ে উপরে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের চিত্ত সুদৃঢ় করার ঘটনা তখন হয়েছে, যখন মূর্তিপূজারি অত্যাচারী বাদশাহ্ যুবকদেরকে দরবারে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে হত্যার আশংকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে স্বীয় মহব্বত, ভীতি ও মাহাত্ম্য এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন যে, এর মুকাবিলায় হত্যা, মৃত্যু ও সর্বপ্রকার বিপদাপদ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে পরিষ্কারভাবে স্বীয় ধর্মবিশ্বাস ঘোষণা করে দেয় যে, তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করে না---ভবিষ্যতেও করবে না। যারা আল্লাহ্‌র জন্য কোন কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের এ ধরনের সাহায্য হয়ে থাকে।

فَاْوٗٓا اِلَى الْكَهْفِ---ইবনে-কাসীর বলেন ঃ আসহাবে কাহ্‌ফের অবলম্বিত কর্মপন্থা ছিল এই যে, যে শহরে থেকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা যায় না, সে শহর পরিত্যাগ করে গুহায় আশ্রয় নেওয়া উচিত। এটাই সব পয়গম্বরের সুন্নত। তাঁরা এরূপ স্থান থেকে হিজরত করে এমন জায়গায় আশ্রয় নেন, যেখানে আল্লাহ্‌র ইবাদত হতে পারে।

وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۭ ذٰلِكَ

مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ۭ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ
لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۝١٧ وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ۚ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ
الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۚ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ۭ لَوِ اطَّلَعْتَ
عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۝١٨

(১৭) তুমি সূর্যকে দেখবে যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডানদিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বামদিকে চলে যায়, অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত। এটা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অন্যতম। আল্লাহ্ যাকে সৎপথে চালান সে-ই সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনও তার জন্য পথপ্রদর্শনকারী সাহায্যকারী পাবেন না। (১৮) তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাই ডানদিকে ও বামদিকে। তাদের কুকুর ছিল সামনের পা দু'টি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে। যদি তুমি উঁকি দিয়ে তাদেরকে দেখতে, তবে পেছন ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে সম্বোধিত ব্যক্তি, গুহাটি এমনভাবে অবস্থিত যে,) যখন সূর্য উদিত হয়, তখন তুমি তাকে দেখবে যে, গুহার ডানদিকে পাশ কেটে যায় (অর্থাৎ গুহায় প্রবেশ পথ থেকে ডানদিকে পৃথক থাকে) এবং যখন অস্ত যায়, তখন (গুহার) বামদিকে সরতে থাকে (অর্থাৎ তখনও গুহার অভ্যন্তরে রোদ প্রবেশ করে না, যাতে তারা রোদের খরতাপে কষ্ট না পায়) এবং তারা গুহার একটি প্রশস্ত চত্বরে ছিল (অর্থাৎ এ জাতীয় গুহা স্বভাবতই কোথাও অপ্রশস্ত এবং কোথাও প্রশস্ত হয়ে থাকে। তারা গুহার এমন চত্বরে ছিল, যা প্রশস্ত, যাতে বাতাস পৌঁছে এবং সংকীর্ণ পরিসরের কারণে মনে অস্থিরতা না আসে।) এটা আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম নিদর্শন (যে, বাহ্যিক কারণাদির বিপরীতে তাদের জন্য আরামের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং জানা গেল যে,) যাকে আল্লাহ্ সৎপথে চালান, সেই সৎপথ পায় এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন আপনি তার জন্য কোন পথপ্রদর্শনকারী সাহায্যকারী পাবেন না। (গুহার যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো এই যে, তাতে সকালে সূর্যোদয়ের সময়েও ভেতরে রোদ প্রবেশ করে না এবং বিকালে সূর্যাস্তের সময়ও প্রবেশ করে না। এটা তখন সম্ভব যখন গুহা উত্তরমুখী অথবা দক্ষিণমুখী হয়। কেননা, আয়াতে যে ডানদিক বামদিক বলা হয়েছে, তার অর্থ যদি গুহায় প্রবেশকারীর ডানদিক-বামদিক হয়, তবে গুহাটি উত্তরমুখী। পক্ষান্তরে যদি গুহা থেকে নির্গমনকারীর ডানদিক-বামদিক অর্থ হয়, তবে গুহাটি দক্ষিণমুখী হবে।) এবং

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি, তারা যখন গুহায় গেল এবং আমি তাদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিলাম, তখন যদি তুমি তাদেরকে দেখতে, তবে) তুমি তাদেরকে জাগ্রত মনে করতে অথচ তারা ছিল নিদ্রিত। (কেননা, আল্লাহ্‌র শক্তি তাদেরকে নিদ্রার লক্ষণাদি থেকে মুক্ত রেখেছিল; যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিবর্তন, দেহ ঢিলে হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। চক্ষু বন্ধ হলেও তা নিদ্রার নিশ্চিত আলামত নয়) এবং (নিদ্রার এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে) আমি তাদেরকে (কোন সময়) ডানদিক এবং (কোন সময়) বামদিকে পার্শ্ব পরিবর্ত করাতাম (এবং এমতাবস্থায়) তাদের কুকুর (যেটি কোন কারণে তাদের সাথে এসে গিয়েছিল, গুহার) প্রবেশদ্বারে সামনের পা দু'টি প্রসারিত করে (বসা) ছিল। (তাদের আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ভয়ভীতির অবস্থা ছিল এই যে,) যদি (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তুমি তাদেরকে উঁকি দিয়ে দেখতে, তবে পেছন ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে তুমি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েতে। [এ আয়াতে সাধারণ লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া জরুরী নয়। এসব ব্যবস্থা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের হিফাযতের জন্য করেছিলেন। কেননা, জাগ্রত ব্যক্তিকে হামলা করা সহজ হয় না। দীর্ঘ সময়ের নিদ্রায় পার্শ্ব পরিবর্তন না করলে এক পার্শ্বকে মাটি খেয়ে ফেলত। গুহার প্রবেশপথে কুকুর বসে থাকা যে হিফাযতের ব্যবস্থা, তা বলই বাহুল্য।]

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা আসহাবে কাহ্‌ফের তিনটি আশ্চর্যজনক অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এগুলো তাঁদের কারামত হিসাবে অলৌকিকভাবে প্রকাশ লাভ করেছে।

এক, দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রায় অভিভূত থাকা এবং তাতে খাদ্য ইত্যাদি ছাড়াই জীবিত থাকা সর্ববৃহৎ কারামত ও অলৌকিক কাণ্ড। পরবর্তী আয়াতে এর বিবরণ আসবে। এখানে বলা হয়েছে যে, এই দীর্ঘ নিদ্রাবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে গুহার অভ্যন্তরে এমনভাবে নিরাপদ রেখেছিলেন যে, সূর্য তাদের কাছ দিয়ে সকাল-বিকাল অতিক্রম করত কিন্তু গুহার ভেতরে তাদের দেহে রোদ পড়ত না। কাছ দিয়ে অতিক্রম করার উপকারিতা জীবনের স্পন্দন প্রতিষ্ঠা, বাতাস, উত্তাপ ও শৈত্যের সমতা ইত্যাদি ছিল। দেহের উপর রোদ না পড়ায় তাদের দেহ ও পোশাকের হিফাযতও হচ্ছিল।

তাদের উপর রোদ না পড়া গুহার বিশেষ অবস্থানের কারণেও হতে পারে; যেমন গুহার প্রবেশপথ উত্তর কিংবা দক্ষিণে এমনভাবে ছিল যে, রোদ স্বভাবতই ভেতরে প্রবেশ করত না। ইবনে কুতায়বা-এর বিশেষ অবস্থানস্থল নির্ণয়ের জন্য এরূপ কষ্ট স্বীকার করেছেন যে, অংকশাস্ত্রের মূলনীতির নিরিখে সে স্থানের দ্রাঘিমা, অক্ষাংশ তথা দৈর্ঘ্য দেশান্তর রেখা (Longitude) ও প্রস্থ দেশান্তররেখা (Latitude) এবং গুহার সমক্ষ নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন।---(মাযহারী) এর বিপরীতে বাজজাজ বলেনঃ তাদের উপর থেকে রোদ দূরে থাকা কোন বিশেষ অবস্থানের কারণে নয়; বরং তাদের কারামাতির কারণে

অলৌকিকভাবে এটাও ছিল। আয়াতের শেষে ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ বাক্য থেকেও বাহ্যত তাই বোঝা যায় যে, রোদ থেকে হিফাযতের এই ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির একটি নিদর্শন ছিল।---(মাযহারী)

পরিষ্কার কথা এই যে, তাদের দেহে যাতে রোদ না পড়ে আল্লাহ্ তা'আলা সেরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ব্যবস্থা গুহার বিশেষ অবস্থানের মাধ্যমে হোক কিংবা রোদের সময় মেঘখণ্ড ইত্যাদির আড়াল করে হোক কিংবা সূর্যের কিরণকে অলৌকিকভাবে তাদের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে হোক। আয়াতে সব সম্ভাবনাই রয়েছে। তন্মধ্যে কোন একটিকে নির্দিষ্ট করার জন্য জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

দীর্ঘ নিদ্রার সময় আসহাবে কাহ্ফ এমতাবস্থায় ছিল যে, দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করত ঃ দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এই যে, আসহাবে কাহ্ফকে এত দীর্ঘকাল নিদ্রায় অভিভূত রাখা সত্ত্বেও তাদের দেহে নিদ্রার চিহ্নমাত্র ছিল না। বরং অবস্থা ছিল এরূপ যে, দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করত। অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন ঃ তাদের চক্ষু খোলা ছিল। নিদ্রার কারণে দেহে যে ঢিলাভাব আসে তাও তাদের মধ্যে ছিল না। বাহ্যত এ অবস্থাও অসাধারণ এবং একটি কারামতই ছিল। এর বাহ্যত কারণ ছিল তাদের হিফাযত করা---যাতে নিদ্রিত মনে করে কেউ তাদের উপর হামলা না করে অথবা তাদের আসবাবপত্র চুরি না করে। বিভিন্ন দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন থেকেও দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করতে পারে। এর আরেক কারণ ছিল এই যে, যাতে এক পার্শ্বকে মাটি খেয়ে না ফেলে।

আসহাবে কাহ্ফের কুকুর ঃ সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে, যে গৃহে কুকুর কিংবা কোন প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা জন্তুদের হিফাযতকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করে প্রত্যহ তার পুণ্য থেকে দু'কিরাত হ্রাস পায়---(কিরাত একটি ছোট ওজনের নাম।) হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে এক তৃতীয় প্রকার কুকুরের ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে ; অর্থাৎ শস্যক্ষেত্রের হিফাযতের জন্য পালিত কুকুর।

এসব হাদীসের ভিত্তিতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ্র ভক্ত আসহাবে কাহ্ফ কুকুর সঙ্গে নিলেন কেন? এর এক উত্তর এই যে, কুকুর পালনের নিষিদ্ধতা শরীয়তে মুহাম্মদীর বিধান। সম্ভবত খৃস্টধর্মে এটা নিষিদ্ধ ছিল না। দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, খুব সম্ভব তাঁরা সম্পদশালী ও পশুপালনকারী ছিলেন। এগুলোর হিফাযতের জন্য কুকুর পালন করতেন। কুকুরের প্রভুভক্তি সুবিদিত। তাঁরা যখন শহর থেকে রওয়ানা হন, তখন কুকুরও তাঁদের অনুসরণ করতে থাকে।

সৎসংসর্গের বরকত কুকুরেরও সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে ঃ ইবনে আতিয়্যা বলেন ঃ আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বলেছেন যে তিনি ৪৬৯ হিজরীতে মিসরের জামে মসজিদে আবুল

ফযল জওহরীর একটি ওয়াজ শুনেছেন। তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ঃ যে ব্যক্তি সৎলোকদেরকে ভালবাসে, তাদের নেকীর অংশ সে-ও পায়। দেখ, আসহাবে কাহ্‌ফের কুকুর তাদেরকে ভালবেসেছে এবং তাদের সঙ্গী হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনেও তার কথা উল্লেখ করেছেন।

কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে ইবনে আতিয়্যার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন ঃ একটি কুকুর যখন সৎলোক ও গুণীদের সংসর্গের কারণে এই মর্যাদা পেতে পারে, তখন আপনি অনুমান করুন, যেসব ঈমানদার তওহীদী লোক আল্লাহ্‌র ওলী ও সৎলোকদেরকে ভালবাসে, তাদের মর্যাদা কতটুকু হবে? এ ঘটনায় সেসব মুসলমানদের জন্য সান্ত্বনা ও সুসংবাদ রয়েছে, যারা আমলে কাঁচা, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা)-কে মনেপ্রাণে ভালবাসে।

সহীহ্ বুখারীর হাদীসে হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদিন আমি ও রসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। মসজিদের দরজায় এক ব্যক্তির সাথে দেখা হল। সে প্রশ্ন করল ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! কিয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন ঃ তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ (যে, আসার জন্য তাড়াহুড়া করছ)? এ কথা শুনে লোকটি মনে মনে কিছুটা লজ্জিত হল। অতঃপর সে বলল ঃ আমি কিয়ামতের জন্য অনেক নামায, রোযা ও দান-খয়রাত সঞ্চয় করিনি, কিন্তু আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ যদি তাই হয়, তবে (শুনে নাও) তুমি (কিয়ামতে) তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি ভালবাস। হযরত আনাস বললেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে এ কথা শুনে আমরা এতই আনন্দিত হলাম যে, মুসলমান হওয়ার পর এর চাইতে বেশি আনন্দিত কোন সময় হইনি। এরপর হযরত আনাস আরও বলেন ঃ (আলহামদুলিল্লাহ্) আমি আল্লাহ্‌কে, তাঁর রসূলকে, আবু বকর ও উমরকে ভালবাসি এবং আশা করি যে, তাঁদের সাথেই থাকব---(কুরতুবী)

আসহাবে কাহ্‌ফকে আল্লাহ্ তা'আলা এত ভয়ভীতি দান করেছিলেন যে, যে দেখত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করা ছাড়া উপায় ছিল না ঃ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ বাহ্যত এতে সাধারণ লোককে সম্বোধন করা হয়েছে। কাজেই জরুরী নয় যে, আসহাবে কাহ্‌ফের ভয়ভীতি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও আচ্ছন্ন করতে পারত। আয়াতে সাধারণ লোককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি উঁকি মেরে দেখ, তবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করবে।

এই ভয়ভীতির কারণ সম্পর্কে আলোচনা অনর্থক। তাই কোরআন ও হাদীস তা বর্ণনা করেনি। সত্য এটাই যে, তাদের হিফাযতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এসব অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। তাদের গায়ে রোদ পড়ত না। দর্শক তাদেরকে জাগ্রত মনে করত। তাদের ভয়ভীতি দর্শককে আচ্ছন্ন করে দিত যাতে পূর্ণরূপে দেখতে না পারে। এসব অবস্থার উদ্ভব স্বাভাবিক কারণাদির পথে হওয়াও সম্ভবপর এবং কারামত হিসাবে অলৌকিক উপায়ে হওয়াও সম্ভবপর। কোরআন ও হাদীস যখন এর কোন বিশেষ কারণ নির্দিষ্ট করেনি, তখন নিছক অনুমানের ভিত্তিতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা নিরর্থক।

তফসীর মাযহারীতে এ বক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এর সমর্থনে ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাসের এই ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তিনি বলেন ঃ আমরা রোমকদের মুকাবিলায় হযরত মুআবিয়ার সাথে এক জিহাদে শরীক হয়েছিলাম, যা 'গযওয়াতুল মুযীফ' নামে খ্যাত। এই সফরে আমরা আসহাবে কাহ্ফের গুহার নিকট দিয়ে গমন করি। হযরত মুআবিয়া আসহাবে কাহ্ফকে জানা ও দেখার জন্য গুহায় যেতে চাইলেন। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস নিষেধ করে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার চাইতে বড় ও উত্তম ব্যক্তিত্বকে [অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে] তাঁদেরকে দেখতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি لَوِ اطَّلَعْتَ আয়াতটি পাঠ করলেন। এ থেকে জানা গেল যে, হযরত ইবনে আব্বাসের মতে আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু হযরত মুআবিয়া ইবনে আব্বাসের মত কবুল করলেন না। (সম্ভবত কারণ এই ছিল যে, তাঁর মতে আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবর্তে সাধারণ লোককে সম্বোধন করা হয়েছে অথবা কোরআন বর্ণিত এই অবস্থা তখনকার, যখন আসহাবে কাহ্ফ জীবিত অবস্থায় নিদ্রামগ্ন ছিলেন। এখন তাদের ওফাতের পর বহু দিন অতিবাহিত হয়েছে। কাজেই এখনও পূর্বের ভয়ভীতি বিদ্যমান থাকা জরুরী নয়। মোটকথা, হযরত মুআবিয়া ইবনে আব্বাসের কথা মানলেন না। তিনি কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিলেন। তারা যখন গুহায় প্রবেশ করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ভীষণ উত্তপ্ত হাওয়া প্রেরণ করলেন। ফলে তারা কিছুই দেখতে পারেনি। ---(মাযহারী)

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ۭ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۭ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۭ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۭ فَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ۝ اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا ۝

(১৯) আমি এমনিভাবে তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বলল ঃ তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? তাদের কেউ বলল ঃ একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। কেউ কেউ বলল ঃ তোমাদের পালনকর্তাই ভাল জানেন তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ। এখন তোমাদের একজনকে

তোমাদের এই মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ কর; সে যেন দেখে কোন খাদ্য পবিত্র। অতঃপর তা থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য; সে যেন নম্রতা সহকারে যায় ও কিছুতেই যেন তোমাদের খবর কাউকে না জানায়। (২০) তারা যদি তোমাদের খবর জানতে পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে, অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তাহলে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (আমি যেমন স্বীয় শক্তি বলে তাদেরকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রাভিভূত রেখেছি) এমনিভাবে (এই দীর্ঘ নিদ্রার পর) আমি তাদেরকে জাগ্রত করেছি, যাতে তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে। (যাতে পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের ফলে আল্লাহ্‌র কুদরত ও হিকমত তাদের কাছে খুলে যায়। (সেমতে) তাদের একজন বলল ঃ (নিদ্রাবস্থায়) তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? (উত্তরে) কেউ কেউ বলল ঃ (সম্ভবত) একদিন অথবা একদিনেরও কিছু কম সময় অবস্থান করেছি। অন্য কেউ কেউ বলল ঃ (এ নিয়ে খোঁজাখুঁজির কি প্রয়োজন?) এ সম্পর্কে তো (সঠিকভাবে) তোমাদের পালনকর্তাই ভাল জানেন তোমরা কতকাল (নিদ্রায়) অবস্থান করেছ। এখন (এই অনর্থক আলোচনা ছেড়ে জরুরী কাজ করা দরকার। তা এই যে,) তোমাদের একজনকে তোমাদের এই টাকা (যা তোমাদের কাছে ছিল। কেননা, খরচাদির জন্য তারা কিছু টাকা-পয়সাও সাথে এনেছিল। মোটকথা, কাউকে এই টাকা) দিয়ে শহরে প্রেরণ কর। (সেখানে পৌঁছে) সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য হালাল। (এখানে ইবনে-জরীরের রেওয়ায়েতে হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের থেকে أزكى শব্দের তফসীর হালাল খাদ্য বর্ণিত আছে। একথা বলা জরুরী ছিল। কারণ, তাদের কওম প্রতিমার নামে জন্তু যবেহ্ করত এবং বাজারে হারাম গোশত প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হত।) অতঃপর তা থেকে সে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে এবং বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে (অর্থাৎ এমন ভাবসাব নিয়ে যাবে যে, কেউ যেন তাকে চিনতে না পারে এবং খাদ্য যাচাই করার মধ্যেও যেন এ কথা জানতে না দেয় যে, সে মূর্তির নামে যবেহ্‌কৃত গোশত হারাম মনে করে।) এবং কাউকে যেন তোমাদের বিষয়ে জানতে না দেয়। (কেননা) তারা যদি (অর্থাৎ শহরবাসীরা। তারা তাদেরকে নিজেদের যমানার মুশরিক মনে করছিল।) তোমাদের খবর পেয়ে যায়, তবে তোমাদেরকে হয় পাথর মেরে হত্যা করবে, না হয় (জোরজবরদস্তিভাবে) তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। এরূপ হলে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كَذٰلِكَ—এ শব্দটি তুলনামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক অর্থ দেয়। এখানে দু'টি ঘটনার পারস্পরিক তুলনা বোঝানো হয়েছে। প্রথম ঘটনা আসহাবে কাহ্‌ফের দীর্ঘকাল পর্যন্ত

নিদ্রাভিভূত থাকা, যা কাহিনীর শুরুতে فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনা দীর্ঘকালীন নিদ্রার পর সুস্থ এবং খাদ্য না পাওয়া সত্ত্বেও সবল ও সুঠাম দেহে জাগ্রত হওয়া। উভয় ঘটনা আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর তুল্য। তাই এ আয়াতে তাদেরকে জাগ্রত করার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে كَذَٰلِكَ শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের নিদ্রা যেমন সাধারণ মানুষের অভ্যস্ত নিদ্রার মত ছিল না, তেমনি তাদের জাগরণও সাধারণ জাগরণ থেকে স্বতন্ত্র ছিল। এরপর لِنَتَسَاءَلُوا বলা হয়েছে, অর্থাৎ যাতে তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে, কতকাল ঘুমানো হয়েছে। এটা জাগ্রত করার আসল কারণ নয়; বরং একটি অভ্যস্ত ঘটনার বর্ণনা। এ কারণেই এর لام-কে তফসীরবিদগণ لام عاقبت অথবা لام صيرورت নাম দিয়েছেন।---(আবু হাইয়্যান, কুরতুবী)

মোটকথা তাদের দীর্ঘ নিদ্রা যেমন কুদরতের একটি নিদর্শন ছিল, এমনিভাবে শত শত বছর পর পানাহার ছাড়া সুস্থ-সবল অবস্থায় জাগ্রত হওয়াও ছিল আল্লাহ্‌র অপার শক্তির একটি নিদর্শন। আল্লাহ্‌র এটাও ইচ্ছা ছিল যে, শত শত বছর নিদ্রামগ্ন থাকার বিষয়টি স্বয়ং তারাও জানুক, তাই পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এর সূচনা হয় এবং সে ঘটনা দ্বারা চূড়ান্ত রূপ নেয়, যা পরবর্তী كَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের গোপন রহস্য শহরবাসীরা জেনে ফেলে এবং সময়কাল নির্ণয়ে মতানৈক্য সত্ত্বেও দীর্ঘকাল গুহায় নিদ্রামগ্ন থাকার ব্যাপার সবার মনেই বিশ্বাস জন্মে।

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ---কাহিনীর শুরুতে সংক্ষেপে বলা হয়েছিল যে, গুহার অবস্থানের সময়কাল সম্পর্কে তাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য হয় এবং তাদের এক দলের উক্তি শুদ্ধ ছিল। এখানে সে কথারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আসহাবে কাহ্‌ফের এক ব্যক্তি প্রশ্ন তুলল যে, তোমরা কতকাল নিদ্রামগ্ন রয়েছ? কেউ কেউ উত্তর দিল ঃ একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ। কেননা তারা সকাল বেলায় গুহায় প্রবেশ করেছিল এবং জাগরণের সময়টি ছিল বিকাল। তাই মনে করল যে, এটা সেই দিন যেদিন আমরা গুহায় প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু তাদের মধ্য থেকেই অন্যেরা অনুভব করল, যে, এটা সম্ভবত সে দিন নয়। তাহলে কতদিন গেল জানা নেই। তাই তারা বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিয়ে বলল ঃ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ অতঃপর তারা এ আলো-

চনাকে অনাবশ্যক মনে করে জরুরী কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল যে, শহর থেকে কিছু খাদ্য আনার জন্য একজনকে প্রেরণ করা হোক।

إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ---এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, গুহার নিকটে একটি বড় শহর ছিল। সেখানে তারা পূর্বে বসবাস করত। এ শহরের নাম সম্পর্কে আবূ হাইয়্যান তফসীর বাহ্‌রে মুহীতে বলেনঃ যে সময়ে আসহাবে কাহ্‌ফ এ শহর থেকে বের হয়েছিল তখন তার নাম ছিল 'আফসূস'। বর্তমানে এর নাম 'তরসূস'। কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেনঃ এ শহরের উপর যখন মূর্তিপূজারীদের আধিপত্য ছিল, তখন এর নাম ছিল 'আফসূস'। অতঃপর যখন মুসলমান অর্থাৎ তৎকালীন খৃস্টানগণ শহরটি দখল করে নেয়, তখন এর নাম রেখে দেয় তরসূস।

بِوَرِقِكُمْ থেকে জানা যায় যে, তারা গুহায় আসার সময় কিছু টাকা-পয়সাও সাথে এনেছিল। অতএব বোঝা গেল যে, প্রয়োজনীয় ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা বৈরাগ্য ও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। ---(বাহ্‌রে মুহীত)

أَزْكَى—أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا শব্দের অর্থ পাক-সাফ। ইবনে জুবায়েরের তফসীর অনুযায়ী এখানে হালাল খাদ্য বোঝানো হয়েছে। এর প্রয়োজন এজন্য দেখা দেয় যে, যখন তারা শহর থেকে বের হয়েছিল, তখন সেখানে মূর্তিদের নামে যবেহ করা হত এবং বাজারে তা-ই বিক্রি করা হত। তাই প্রেরিত ব্যক্তিকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, খাদ্য হালাল কিনা, তা যেন যাচাই করে আনা হয়।

মাস'আলা ঃ এ থেকে জানা গেল যে, শহরে কিংবা যে বাজারে অথবা যে হোটেলে অধিকাংশ হারাম খাদ্য প্রচলিত, সেখানকার খাদ্য যাচাই না করে খাওয়া জায়েয নয়।

رَجْم—أَوْ يَرْجُمُوكُمْ শব্দের অর্থ পাথর মেরে মেরে হত্যা করা। গুহায় যাওয়ার পূর্বে বাদশাহ্‌ হুমকি দিয়েছিল যে, তোমাদের এ ধর্ম পরিত্যাগ না করলে তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, তাদের মতে ধর্ম-ত্যাগীদের শাস্তি ছিল প্রস্তর বর্ষণের মাধ্যমে হত্যা, যাতে সবাই এতে অংশগ্রহণ করে এবং সমগ্র জাতি যেন ক্রোধ প্রকাশ করে হত্যা করে।

ইসলামী শরীয়তে বিবাহিত নারী ও পুরুষের যিনার শাস্তিও প্রস্তর বর্ষণে হত্যা। সম্ভবত এরও কারণ এই যে, যে ব্যক্তি লজ্জাশরমের সব বাধা ছিন্ন করে এহেন জঘন্য কর্মে লিপ্ত হয়, তার হত্যা প্রকাশ্য স্থানে সব লোকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে হওয়া

উচিত। এভাবে তার লাঞ্ছনাও পুরোপুরি হবে এবং মুসলমান কার্যক্ষেত্রে স্বীয় ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে যাতে ভবিষ্যতে জাতির মধ্যে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।

فَابْعَثُوْۤا اَحَدَكُمْ ----আসহাবে কাহ্ফ নিজেদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে শহরে প্রেরণের জন্য মনোনীত করে এবং খাদ্য আনার জন্য তার কাছে টাকা অর্পণ করে। কুরতুবী বলেনঃ এ থেকে কয়েকটি মাস'আলা জানা যায়। এক. অর্থ-সম্পদে অংশীদারিত্ব জায়েয। দুই. অর্থ সম্পদে উকিল নিযুক্ত করা জায়েয এবং শরীকানাধীন সম্পদ কোন এক ব্যক্তি অন্যদের অনুমতিক্রমে ব্যয় করতে পারে। তিন. খাদ্যদ্রব্যের কয়েকজন সঙ্গী শরীক হলে তা জায়েয; যদিও খাওয়ার পরিমাণ বিভিন্নরূপ হয়----কেউ কম খায় আর কেউ কেউ বেশী খায়।

وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْۤا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ؕ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰۤى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿۲۱﴾

(২১) এমনিভাবে আমি তাদের খবর প্রকাশ করে দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজেদের কর্তব্য বিষয়ে পরস্পরে বিতর্ক করছিল, তখন তারা বললঃ তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর। তাদের পালনকর্তা তাদের বিষয়ে ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হলো, তারা বললঃ আমরা অবশ্যই তাদের স্থানে মসজিদ নির্মাণ করব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (আমি যেভাবে স্বীয় কুদরতবলে তাদেরকে নিদ্রামগ্ন করেছি এবং জাগ্রত করেছি) এমনিভাবে আমি স্বীয় কুদরত ও হিকমত দ্বারা তখনকার লোকদেরকে তাদের বিষয় জানিয়ে দিয়েছি, যাতে (অন্যান্য অনেক উপকারের মধ্য থেকে একটি উপকার এ-ও হয় যে,) তারা (এ ঘটনার সূত্র ধরে) এ বিষয়ে বিশ্বাস (অথবা অধিক বিশ্বাস) অর্জন করে যে, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। (তারা যদি পূর্ব থেকে কিয়ামতে জীবিত হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাসী থেকে থাকে, তবে এ ঘটনা দ্বারা তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে। পক্ষান্তরে তারা যদি পূর্বে কিয়ামতে অবিশ্বাসী হয়, তবে এ ঘটনা দেখে তাদের বিশ্বাস জন্মাবে। আসহাবে কাহ্ফের জীবদ্দশায় এ ঘটনা ঘটে। এরপর তারা গুহার মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করে। তখন তাদের সম্পর্কে

সমসাময়িক লোকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। পরবর্তী আয়াতে এই মতানৈক্য বর্ণিত হয়েছে)। ঐ সময়টিও স্মরণযোগ্য, যখন তখনকার লোকেরা তাদের নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে পারস্পরিক বিতর্ক করছিল। (এই বিতর্ক ছিল গুহার মুখ বন্ধ করার ব্যাপারে, যাতে তাদের মৃতদেহ নিরাপদ থাকে অথবা তাদের স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়)। তারা বলল ঃ তাদের (গুহার) নিকটে সৌধ নির্মাণ কর। (এরপর মতানৈক্য হলো যে, সৌধটি কি হবে? এই মতানৈক্যের সময়) তাদের পালনকর্তা তাদের (বিভিন্ন মতামতের) বিষয় ভাল জানতেন। (অবশেষে) যারা স্বীয় কর্তব্যে অটল ছিল (অর্থাৎ রাজপরিবারের লোক, যারা তখন সত্যধর্মের অনুসারী ছিল) তারা বলল, আমরা তাদের স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করব। (মসজিদটি এ বিষয়েরও চিহ্ন হবে যে, তারা স্বয়ং উপাসনাকারী ছিল---উপাস্য ছিল না। অন্য রকম কোন সৌধ নির্মাণ করলে ভবিষ্যত বংশধররা হয়তো তাদেরকেই উপাস্য সাব্যস্ত করে ফেলতে পারত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ—এ আয়াতে আসহাবে কাহ্‌ফের রহস্য শহর-বাসীদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়া, এর রহস্য এবং পরকাল ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস অর্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তফসীরে কুরতুবীতে এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা এভাবে উল্লিখিত রয়েছে ঃ

অসহাবে কাহ্‌ফের বিষয় শহরবাসীদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়া ঃ আসহাবে কাহ্‌ফের প্রস্থানকালে অত্যাচারী ও মুশরিক বাদশাহ্ দাকিয়ানুসের রাজত্ব ছিল। তার মৃত্যুর পর কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হলে শহরের উপর সত্যপন্থী তওহীদবাদী লোকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের বাদশাহ্ ছিলেন একজন সৎ ও সাধু ব্যক্তি। তফসীর মাযহারীতে ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত দৃষ্টে তার নাম 'বাইদুসীস' লেখা রয়েছে। তার শাসনকালে ঘটনাক্রমে কিয়ামতে মৃতদের পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রশ্নে মতানৈক্য ছড়িয়ে পড়ে। একদল একে অস্বীকার করতে থাকে। তারা বলে যে, মানবদেহ পচে-গলে অণু-পরমাণুর আকারে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ার পর পুনর্বার জীবিত হওয়া অসম্ভব। বাদশাহ্ বায়দুসীস চিন্তিত হলেন যে, কিভাবে তাদের সন্দেহ নিরসন করা যায়। কোন উপায় না দেখে তিনি চটের পোশাক পরিধান করত ছাই-এর স্তূপে বসে আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি করে দোয়া করতে লাগলেন ঃ হে আল্লাহ্, আপনিই তাদের বিশ্বাস সংশোধন ও সৎ পথে ফিরে আসার কোন উপায় করে দিন। একদিকে বাদশাহ্ কান্নাকাটি ও দোয়ায় মশগুল ছিলেন, অপরদিকে আল্লাহ্ তার দোয়া কবুল করার ব্যবস্থা করলেন যে, আসহাবে কাহ্‌ফের নিদ্রাভঙ্গ হলো। তারা তাদের 'তামলিখা' নামক এক ব্যক্তিকে খাদ্য আনার জন্য বাজারে প্রেরণ করল। সে দোকানে পৌঁছল এবং খাদ্যের মূল্য হিসাবে তিন শ বছর পূর্বেকার বাদশাহ দাকিয়ানুসের আমলে প্রচলিত মুদ্রা পেশ করল। দোকানদার অবাকবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। এ মুদ্রা কোথা থেকে এল? কোন্ আমলের? তা অন্যান্য

দোকানদারকে দেখানো হলো। সবাই বলল ঃ এ ব্যক্তি কোথাও প্রাচীন ধনভাণ্ডার লাভ করেছে। সেখান থেকেই এই মুদ্রা বের করে এনেছে। সে অস্বীকার করে বলল ঃ আমি কোন ধনভাণ্ডার পাইনি এবং কারও কাছ থেকে এ মুদ্রা আনিনি। এটা আমার নিজের।

বাজারীরা তাকে গ্রেফতার করে বাদশাহ্‌র সামনে উপস্থিত করল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বাদশাহ্ সাধু ও আল্লাহ্‌ভক্ত লোক ছিলেন। তিনি প্রাচীন রাজকীয় ধনভাণ্ডারে রক্ষিত সে ফলকটিও দেখেছিলেন, যাতে আসহাবে কাহ্‌ফের নাম ও তাদের পলায়নের ঘটনা লিপিবদ্ধ ছিল। কারও কারও মতে স্বয়ং অত্যাচারী বাদশাহ্ দাকিয়ানুস এই ফলকটি লিখিয়েছিল এবং তাতে বলা হয়েছিল যে, এরা দাগী অপরাধী। এদের নাম-ঠিকানা সংরক্ষিত থাকতে হবে। যখন যেখানে পাওয়া যায়, গ্রেফতার করতে হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে শাহী দফতরে কিছুসংখ্যক ঈমানদারও ছিল। তারা মূর্তিপূজাকে ঘৃণা করত এবং আসহাবে কাহ্‌ফকে সত্যপন্থী মনে করত। তবে তা প্রকাশ করার সাহস তাদের ছিল না। তারা স্মৃতি হিসেবে এই ফলক লিপিবদ্ধ করেছিল। সে ফলকের নামই রকীম। সে কারণেই আসহাবে কাহ্‌ফকে আসহাবে রকীমও বলা হয়।

মোটকথা, বাদশাহ্ এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞাত ছিলেন। এ সময় তার আন্তরিক কামনা ছিল এই যে, কোন না কোন উপায়ে মানুষ জানুক যে, মৃতদেহকে পুনরুজ্জীবিত করা আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

এজন্য তামলিখার অবস্থা শুনে বাদশাহ্‌র নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, সে আসহাবে কাহ্‌ফের একজন। বাদশাহ্ বললেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতাম যে, আমাকে তাদের সাথে মিলিয়ে দাও, যারা বাদশাহ্ দাকিয়ানুসের আমলে ঈমান রক্ষা করার জন্য পলায়ন করেছিলেন। সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা আমার দোয়া কবুল করেছেন। এতে মৃতদেহ জীবিত করে হাশরে একত্র করাকে বিশ্বাস করার মত কোন প্রমাণ নিহিত থাকতে পারে। এরপর বাদশাহ্ তামলিখাকে বললেন ঃ আমাকে সে গুহায় নিয়ে চল, যেখান থেকে তুমি এসেছ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ

বাদশাহ্ নগরবাসীদের এক বিরাট দল সমভিব্যাহারে গুহায় পৌঁছাল। গুহার নিকটবর্তী হয়ে তামলিখা বলল ঃ আপনারা একটু থামুন। আমি সঙ্গীদেরকে প্রকৃত ব্যাপারটি জানিয়ে দেই যে, এখন বাদশাহ্ তওহীদবাদী মুসলমান। কওমও মুসলমান। তারা সাক্ষাতের জন্য আগমন করেছে। একথা জানানোর আগে আপনারা গেলে তারা মনে করবে যে, আমাদের শত্রু বাদশাহ্ চড়াও হয়েছে। সেমতে তামলিখা গুহায় পৌঁছে তাদেরকে আদ্যোপ্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করল। আসহাবে কাহ্‌ফ এতে খুব আনন্দিত হলো এবং সসম্মানে বাদশাহ্‌কে অভ্যর্থনা জানাল। অতঃপর তারা গুহায় ফিরে গেল। অধিকাংশ রেওয়ায়েতে রয়েছে, তামলিখা যখন সঙ্গীদেরকে সকল বৃত্তান্ত অবহিত করল, তখনই সবার মৃত্যু হয়ে গেল; বাদশাহ্‌র সাথে সাক্ষাত হতে পারেনি। বাহরে-মুহীতে আবূ হাইয়্যান এক্ষেত্রে এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, সাক্ষাতের পর গুহাবাসীরা

বাদশাহ্ ও নগরবাসীদেরকে বলল ঃ এখন আমরা বিদায় হতে চাই। এই বলে তারা গুহার অভ্যন্তরে চলে গেল এবং তখনই আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে মৃত্যুদান করলেন।

মোটকথা, আল্লাহ্‌র কুদরতের এই আশ্চর্য ঘটনাটি নগরবাসীদের সামনে জাজ্বল্যমান হয়ে ফুটে উঠল। তাদের বিশ্বাস হলো যে, যে সত্তা জীবিত মানুষদেরকে তিন শ বছর পর্যন্ত পানাহার ছাড়া জীবিত রাখতে পারেন এবং এত দীর্ঘকাল নিদ্রামগ্ন রাখার পর আবার সুস্থ ও সবল অবস্থায় জাগ্রত করতে পারেন, তাঁর পক্ষে মৃত্যুর পরও মৃতদেহগুলোকে জীবিত করা মোটেই কঠিন নয়। এই ঘটনার ফলে তাদের অবিশ্বাসের কারণ দূর হয়ে গেল। এখন জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতকে মানবীয় ক্ষমতার আলোকে বোঝার চেষ্টা করা মূর্খতা বৈ নয়।

এ বক্তব্যের প্রতিই এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ

اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا —অর্থাৎ আমি আসহাবে কাহ্‌ফকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রামগ্ন রাখার পর জাগ্রত করে বসিয়ে দিয়েছি, যাতে লোকেরা বুঝে নেয় যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা অর্থাৎ কিয়ামতে মৃতদেরকে জীবিত করার ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতের আগমনে কোন সন্দেহ নেই।

আসহাবে কাহ্‌ফের ওফাতের পর লোকদের মধ্যে মতানৈক্য ঃ আসহাবে কাহ্‌ফের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা সম্পর্কে কারও দ্বিমত ছিল না। তাদের ওফাতের পর সবাই মনে করল যে, গুহার নিকটে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু সৌধটি কি ধরনের হবে, এ সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা দিল। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, নগরবাসীদের মধ্যে তখনও কিছু মূর্তিপূজারী ছিল। তারাও আসহাবে কাহ্‌ফের যিয়ারতের জন্য আগমন করত। তারা মত দিল যে, কোন জনহিতকর সৌধ নির্মাণ করা হোক। কিন্তু শাসকবর্গ ও বাদশাহ্ মুসলমান ছিলেন এবং তারাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা প্রস্তাব দিল যে, এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হোক যা স্মৃতিচিহ্নও হবে এবং ভবিষ্যতে মূর্তিপূজা থেকে বিরত রাখার কারণও হবে। এখানের মতানৈক্যের উল্লেখ করে মাঝখানে কোরআনের এই বাক্যটি রয়েছে ঃ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ

—অর্থাৎ তাদের পালনকর্তা তাদের অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানেন।

তফসীর বাহ্‌রে মুহীতে এ বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দু'টি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটি নগরবাসীদেরই উক্তি। কেননা, তাদের ওফাতের পর যখন স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন মৃতিসৌধে সাধারণত যাদের স্মৃতিসৌধ, তাদের নাম ও বিশেষ অবস্থাদির শিলালিপি সংযুক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আসহাবে কাহ্‌ফের বংশ ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্নরূপ কথাবার্তা হয়েছে। যখন তারা কোন সত্য উদ্‌ঘাটন

করতে পারেনি, তখন নিজেরাই পরিশেষে অক্ষম হয়ে বলেছে ঃ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ

এরপর তারা আসল কাজ অর্থাৎ স্মৃতিসৌধ নির্মাণে মনোনিবেশ করেছে। যারা প্রবল ছিল, তাদের মসজিদ নির্মাণসংক্রান্ত প্রস্তাবটিই গৃহীত হলে।

দুই. এ বাক্যটি আল্লাহ্ তা'আলার। এতে বর্তমানকালের বিতর্ককারী ও মতানৈক্য-কারীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা যখন আসল সত্য জান না এবং জানার উপায়ও তোমাদের কাছে নেই তখন এই আলোচনায় জড়িয়ে অনর্থক কেন সময় নষ্ট কর? রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যমানায় ইহুদীরা এ ঘটনা সম্পর্কে এ ধরনের ভিত্তিহীন কথা-বার্তা বলত। সম্ভবত তাদেরকে হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য।

মাস'আলা ঃ এ ঘটনা থেকে এতটুকু জানা গেল যে, ওলী-দরবেশদের কবরের কাছে নামাযের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা গোনাহ্ নয়। এক হাদীসে পয়গম্বরদের কবরকে যারা মসজিদে পরিণত করে, তাদের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে। এর অর্থ স্বয়ং কবরকে সিজদার জায়গায় পরিণত করা, যা সর্ববাদীসম্মত শিরক ও হারাম। —(মাযহারী)

سَيَقُولُونَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَّبِّيْ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۖ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا ۖ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾

(২২) অজ্ঞাত বিষয়ে অনুমানের উপর ভিত্তি করে এখন তারা বলবে ঃ তারা ছিল তিন জন; তাদের চতুর্থটি তাদের কুকুর। একথাও বলবে ঃ তারা পাঁচ জন। তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। আরও বলবে ঃ তারা ছিল সাতজন। তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। বলুন ঃ আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। তাদের খবর অল্প লোকই জানে। সাধারণ আলোচনা ছাড়া আপনি তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন না এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তাদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন আসহাবে কাহ্ফের কাহিনী বর্ণনা করবে, তখন কেউ কেউ বলবে ঃ তারা ছিল তিন জন, চতুর্থটি তাদের কুকুর এবং কেউ কেউ বলবে ঃ তারা ছিল পাঁচ জন, ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। (আর) তারা অজ্ঞাত বিষয় অনুমান করে কথা বলছে এবং

কেউ কেউ বলবেঃ তারা সাতজন, অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। আপনি মতভেদ-কারীদেরকে বলে দিনঃ আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা খুব বিশুদ্ধরূপে জানেন যে, (এসব বিভিন্ন উক্তির মধ্যে কোন উক্তি বিশুদ্ধ, না সবই ভ্রান্ত)। তাদের সংখ্যা বিশুদ্ধরূপে খুব কম লোকই জানে। সংখ্যা নির্ণয়ের মধ্যে বিশেষ কোন উপকার নিহিত নেই, তাই আয়াতে কোন সুস্পষ্ট ফয়সালা করা হয়নি। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, انا من القليل كانوا سبعة অর্থাৎ অল্প সংখ্যকের মধ্যে আমিও একজন। তাদের সংখ্যা ছিল সাত। (দুররে-মনসূর) আয়াতেও এ উক্তির সত্যতার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেননা, এ উক্তি উদ্ধৃত করে একে নাকচ করা হয়নি। কিন্তু প্রথমোক্ত দু'টি উক্তি উদ্ধৃত করার পর رجما بالغيب বলে নাকচ করা হয়েছে। والله اعلم অতএব (যদি তারা মতভেদ করা থেকে বিরত না হয় তবে) আপনি সাধারণ আলোচনা ছাড়া তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন না। (অর্থাৎ رجما بالغيب এবং قل ربى اعلم بعدتهم বলে কোরআনে সংক্ষেপে তাদের ধারণা নাকচ করা হয়েছে। এটাই সাধারণ আলোচনা। তাদের আপত্তির জওয়াবে এর চাইতে বেশি মনোনিবেশ করা এবং স্বীয় দাবি প্রমাণের জন্য বেশি চেষ্টা করা সমীচীন নয়। কারণ, এই আলোচনাতে বিশেষ কোন উপকারিতা নেই।) এবং আপনি তাদের (আসহাবে কাহ্‌ফের) সম্পর্কে এদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। [রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যেমন এদের আপত্তির উত্তরদানে পরিশ্রম করতে বারণ করা হয়েছে, তেমনি এ সম্পর্কে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, যতটুকু জরুরী ছিল, ততটুকু কোরআনেই এসে গেছে। অনাবশ্যক জিজ্ঞাসাবাদ ও খোঁজাখুঁজি পয়গম্বরের মর্যাদার পরিপন্থী।]

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিরোধপূর্ণ আলোচনায় কথাবার্তার উত্তম পন্থাঃ سيقولون---অর্থাৎ তারা বলবে।---'তারা' কারা---এ সম্পর্কে দু'রকম সম্ভাবনা আছে। এক. এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে, যারা আসহাবে কাহ্‌ফের আমলে তাদের নাম, বংশ ইত্যাদি সম্পর্কে মতভেদ করেছিল। তাদের মধ্যেই কেউ কেউ তাদের সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি কেউ কেউ দ্বিতীয় উক্তি এবং কেউ কেউ তৃতীয় উক্তি করেছিল।---(বাহর)

দুই. سيقولون বাক্যে নাজরানের খৃস্টান সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে আসহাবে কাহ্‌ফের সংখ্যা সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল। নাজরানের খৃস্টান সম্প্রদায় তিন দলে বিভক্ত ছিল। এক দলের নাম ছিল 'মালকানিয়া'। এরা সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি, অর্থাৎ তিন বলেছিল। দ্বিতীয় দলের নাম ছিল 'এয়াকুবিয়্যা'।

তারা দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ পাঁচ বলেছিল। তৃতীয় দল ছিল 'নাস্তরীয়া'। তারা তৃতীয় সংখ্যা অর্থাৎ সাত বলেছিল। কেউ কেউ বলেন ঃ তৃতীয় উক্তিটি ছিল মুসলমানদের। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাদীস এবং কোরআনের ইঙ্গিত দ্বারা তৃতীয় উত্তরের বিশুদ্ধতাই প্রমাণিত হয়।---(বাহ্‌রে মুহীত)

وَثَامِنُهُمْ----এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, আসহাবে কাহ্‌ফের সংখ্যা সম্পর্কে আয়াতে তিনটি উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে ঃ তিন, পাঁচ ও সাত। প্রত্যেকটি সংখ্যার পর তাদের কুকুরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রথমোক্ত দুই উক্তিতে তাদের সংখ্যা ও কুকুরের গণনার মাঝখানে واو عاطفة (সংযোগকারী ওয়াও) ব্যবহার না করে বলা হয়েছে ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ এবং خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ কিন্তু তৃতীয় উক্তিতে سبعة-এর واو عاطفة এনে وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ বলা হয়েছে।

তফসীরবিদগণ এর কারণ এই লিখেন যে, আরবদের কাছে সংখ্যার প্রথম ধাপ ছিল সাত। সাতের পর যে সংখ্যা আসত, তা অনেকটা পৃথক বলে গণ্য হত; যেমন আজকাল নয় সংখ্যাটি নয় পর্যন্ত একক সংখ্যা ধরা হয়। দশ থেকে দ্বি-সংখ্যা আরম্ভ হয়। এ কারণেই আরবরা তিন থেকে সাত পর্যন্ত সংখ্যা গণনায় واو عاطفة ব্যবহার করত না। সাতের পর কোন সংখ্যা বর্ণনা করতে হলে واو عاطفة এনে পৃথক করে বর্ণনা করত। এ জন্যই এই واو ثمانية কে واو নাম দেয়া হয়। ---(মাযহারী)

আসহাবে কাহ্‌ফের নাম ঃ প্রকৃতপক্ষে কোন সহীহ্ হাদীস থেকে আসহাবে কাহ্‌ফের নাম সঠিকভাবে প্রমাণিত নেই। তফসীরী ও ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে বিভিন্ন নাম বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাবারানী 'মু'জামে আওসাত' গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদ সহযোগে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, সেটিই বিশুদ্ধতর। এতে তাদের নাম নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

মুফসালমিনা, তামলিখা, মরতূনুস, সনূনুস, সারিনূতুস, যুনওয়াস, কায়াস্তাতি-য়ূনুস।

فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا

অর্থাৎ আপনি আসহাবে কাহ্‌ফের সংখ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের সাথে বৃথা বিতর্কে

প্রবৃত্ত হবেন না ; বরং সাধারণ আলোচনা করুন। আপনি নিজেও তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।

বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা থেকে বিরত থাকা উচিত ঃ বর্ণিত উভয় বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে আলিম সম্প্রদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক নীতি। কোন প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দিলে জরুরী বিষয়গুলো বর্ণনা করা উচিত। এরপরও যদি কেউ অনাবশ্যক আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়ে, তবে তার সাথে সাধারণ আলোচনা করে বিতর্ক শেষ করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। নিজের দাবি প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যাওয়া এবং প্রতিপক্ষের দাবি খণ্ডনে অধিক জোর দেয়া অনুচিত। কারণ, এতে বিশেষ কোন উপকারিতা নেই। উপরন্তু অতিরিক্ত আলোচনা ও কথা কাটাকাটিতে মূল্যবান সময়ও নষ্ট হয় এবং পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টিরও সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয় বাক্যে দ্বিতীয় নির্দেশ এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ওহীর মাধ্যমে আসহাবে কাহ্‌ফ সম্পর্কে যে পরিমাণ তথ্য আপনাকে সরবরাহ করা হয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। কারণ এতটুকুই যথেষ্ট। আরও বেশি জানার জন্য খোঁজাখুজি ও মানুষের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার এক উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, তার অজ্ঞতা ও মূর্খতা জনসমক্ষে ফুটে উঠুক---এটাও পয়গম্বরী চরিত্রের পরিপন্থী তাই ভাল ও মন্দ উভয় উদ্দেশ্যে অপরকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ
وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ
مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا
تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ ۖ وَلَا يُشْرِكُ
فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

২৩) আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেনই না যে, সেটি আমি 'আগামী কাল করব' (২৪) 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে' বলা ব্যতিরেকে। যখন ভুলে যান, তখন আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন এবং বলুন ঃ আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে এর

চাইতেও নিকটতম সত্যের পথনির্দেশ করবেন। (২৫) তাদের উপর তাদের গুহায় তিন শ' বছর, অতিরিক্ত আরও নয় বছর অতিবাহিত হয়েছে। (২৬) বলুন ঃ তারা কতকাল অবস্থান করেছে, তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শুনেন। তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যদি লোকেরা আপনার কাছে কোন উত্তরসাপেক্ষ বিষয় জিজ্ঞেস করে এবং আপনি উত্তর দানের ওয়াদা করেন, তবে এর সাথে 'ইনশাআল্লাহ্' কিংবা এর সামর্থ-বোধক কোন বাক্য অবশ্যই সংযুক্ত করবেন; বরং বিশেষ করে ওয়াদার ক্ষেত্রেই নয়, প্রত্যেক কাজে এর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন যে) আপনি কোন কাজের বিষয় এমন বলবেন না যে, আমি তা (উদাহরণত) আগামীকাল করব, কিন্তু আল্লাহ্র চাওয়াকে (এর সাথে) যুক্ত করে নিন। [অর্থাৎ 'ইনশাআল্লাহ্' ইত্যাদিও সাথে সাথে বলে দিন। ভবিষ্যতে এমন না হওয়া চাই, যেমন এ ঘটনায় হয়েছে যে, লোকেরা আপনাকে রূহ্, আসহাবে কাহ্ফ ও যুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করায় আপনি 'ইনশাআল্লাহ্' না বলেই তাদের সাথে আগামীকাল জওয়াব দানের ওয়াদা করেছেন। এরপর পনর দিন পর্যন্ত ওহী আসেনি, যদ্দরুন আপনি খুব চিন্তিত হয়েছেন। এই নির্দেশের সাথে সাথে প্রশ্ন-কারীদের প্রশ্নের জওয়াব নাযিল হয়। (লুবাব)] এবং যখন আপনি ঘটনাচক্রে 'ইন-শাআল্লাহ্' বলা (ভুলে যান, এবং পরে কোন সময় স্মরণ হয়) তবে (তখনই 'ইনশা-আল্লাহ্' বলে) আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুণ এবং (তাদেরকে এ কথাও) বলে দিন যে, আশাকরি আমার পালনকর্তা আমাকে (নবুয়তের প্রমাণ হওয়ার দিক দিয়ে) এর (অর্থাৎ গুহাবাসীর কাহিনীর) চাইতেও সত্যের নিকটতম পথনির্দেশ করবেন। [উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা আমার নবুয়তের পরীক্ষা নেয়ার জন্য আসহাবে কাহ্ফ ইত্যাদির কাহিনী জিজ্ঞেস করেছ, যা আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়ে তোমা-দেরকে সন্তুষ্ট করেছেন। কিন্তু আসল কথা এই যে, নবুয়ত সপ্রমাণের জন্য এসব কাহিনীর প্রশ্ন ও উত্তর খুব বড় প্রমাণ হতে পারে না। এ কাজ তো ইতিহাস ভালরূপ জানা থাকলে সাধারণ লোকও করতে পারে। আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা নবুয়ত সপ্র-মানের জন্য এর চাইতেও বড় অকাট্য প্রমাণাদি এবং মু'জিযা দান করেছেন। তন্মধ্যে সবরূহৎ প্রমাণ হচ্ছে স্বয়ং কোরআন। সমগ্র বিশ্ব মিলেও এর একটি আয়াতের অনু-করণে কোন সূরা রচনা করতে পারেনি। এ ছাড়া হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের এমন ঘটনাবলী ওহীর মাধ্যমে আমাকে বলে দিয়েছেন, যেগুলো কালের দিক দিয়েও আসহাবে কাহ্ফ ও যুলকারনাইনের ঘটনার তুলনায় অধিক দূরবর্তী এবং যেগুলো সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করাও ওহী ব্যতীত কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। মোটকথা তোমরা তো আসহাবে কাহ্ফ ও যুলকারনাইনের ঘটনাকে অধিক আশ্চর্যজনক বলে মনে করে এগুলোকেই নবুয়ত পরীক্ষার প্রশ্ন হিসেবে পেশ করেছ, কিন্তু আল্লাহ্ তা'

আমাকে এর চাইতেও অধিক আশ্চর্যজনক বিষয়সমূহের জ্ঞান দান করেছেন)] এবং আসহাবে কাহ্‌ফের সংখ্যার ব্যাপারে তারা যেমন মতভেদ করে, তেমনি তাদের নিদ্রার সময়কাল সম্পর্কেও তারা বিস্তর মতভেদ করে। আমি এ সম্পর্কে সঠিক কথা বলে দিচ্ছি যে, তারা তাদের গুহায় (নিদ্রিতাবস্থায়) তিন শ' বছরের পর আরও নয় বছর অবস্থান করেছে। (যদি এই সঠিক কথা শুনেও তারা মতভেদ করতে থাকে, তবে) আপনি বলে দিনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (নিদ্রিত) থাকার সময়কাল (তোমাদের চাইতে) অধিক জানেন। (তাই তিনি যা বলেছেন, তাই সঠিক। আর বিশেষ করে এ ঘটনার ক্ষেত্রেই কেন, তার তো অবস্থা এই যে) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে! তিনি কত চমৎকার দেখেন ও কত চমৎকার শুনেন! তিনি ব্যতীত তাদের অন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কাউকে স্বীয় কর্তৃত্বের শরীক করেন না। (সারকথা এই যে, তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই এবং শরীকও নেই। এমন মহান সত্তার বিরোধিতাকে খুব ভয় করা উচিত।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত চার আয়াতেই আসহাবে কাহ্‌ফের কাহিনী সমাপ্ত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম দু'আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতকালে কোন কাজ করার ওয়াদা বা স্বীকারোক্তি করলে এর সাথে 'ইনশাআল্লাহ্' বাক্যটি যুক্ত করতে হবে। কেননা, ভবিষ্যতে জীবিত থাকবে কিনা, তা কারও জানা নেই। জীবিত থাকলেও কাজটি করতে পারবে কিনা, তারও নিশ্চয়তা নেই। কেজেই মু'মিনের উচিত মনে মনে এবং মুখে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা ভবিষ্যতে কোন কাজ করার কথা বললে এভাবে বলা দরকার যদি আল্লাহ্ চান, তবে আমি এ কাজটি আগামীকাল করব। ইনশাআল্লাহ্ বাক্যের অর্থ তাই।

তৃতীয় আয়াতে একটি বিরোধপূর্ণ আলোচনার ফয়সালা করা হয়েছে। এতে আসহাবে কাহ্‌ফের আমলের লোকদের মতামতও বিভিন্নরূপ ছিল এবং বর্তমান যুগের ইহুদী ও খৃস্টানদের মতামতও বিভিন্নরূপ। অর্থাৎ গুহায় নিদ্রামগ্ন থাকার সময়কাল এ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, এই সময়কাল তিন শ' নয় বছর। কাহিনীর শুরুতে فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا বলে যে বিষয়টি সংক্ষেপে বলা হয়েছিল, এখানে যেন তাই বর্ণনা করে দেয়া হল।

এরপর চতুর্থ আয়াতে আবার মতভেদকারীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আসল সত্য জান না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব অদৃশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাত, শ্রোতা ও দ্রষ্টা। তিনি তিন শ' নয় বছরের সময়কাল বর্ণনা করেছেন। এতেই সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত।

ভবিষ্যত কাজের জন্য ইনশাআল্লাহ্ বলা ঃ 'লুবাব' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে প্রথম দু'আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, মক্কার কাফিররা

যখন ইহুদীদের শিক্ষা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তখন তিনি ইনশাআল্লাহ্ না বলেই তাদের সাথে আগামীকাল জওয়াব দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন। নৈকট্যশীলদেরকে সামান্য ত্রুটির জন্যও হুঁশিয়ার করা হয়। তাই পনের দিন পর্যন্ত কোন ওহী আগমন করেনি। রসূলুল্লাহ্ (সা) খুবই চিন্তিত হলেন। মুশরিকরা বিদ্রূপ ও উপহাসের সুযোগ পেল। পনের দিন বিরতির পর যখন এ সূরায় প্রশ্নের জওয়াব নাযিল হল, তখন এর সাথে হিদায়েতের জন্য এ দু'টি আয়াতও অবতীর্ণ হল যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করার কথা বলা হলে ইনশাআল্লাহ্ বলে এ কথার স্বীকারোক্তি করা উচিত যে, প্রত্যেক কাজ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আয়াতদ্বয়কে আসহাবে কাহ্ফের কাহিনীর শেষাংশে সংযুক্ত করা হয়েছে ঃ

মাস'আলা ঃ এ আয়াত থেকে প্রথমত জানা গেল যে, এরূপ ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ্ বলা মুস্তাহাব। দ্বিতীয়ত যদি ভুলক্রমে বাক্যটি না বলা হয়, তবে যখনই স্মরণ হয়, তখনই তা বলা দরকার। আয়াতে বর্ণিত বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য এ বিধান। অর্থাৎ শুধু বরকতলাভ ও দাসত্বের স্বীকারোক্তির জন্য এ বাক্য বলা উদ্দেশ্য---কোন শর্ত লাগানো উদ্দেশ্য নয়। কাজেই এ থেকে জরুরী হয় না যে, কেনাবেচা ও পারস্পরিক চুক্তির মধ্যেও অনুরূপ বিধান হবে। কেনাবেচার মধ্যে শর্ত লাগানো হয়, এবং উভয় পক্ষের জন্য শর্ত লাগানোর উপর পারস্পরিক চুক্তি নির্ভরশীল থাকে। এসব ক্ষেত্রেও যদি চুক্তির সময় শর্ত লাগানো ভুলে যায় এবং পরে কোন সময় স্মরণে আসে, তবে যা ইচ্ছা তা শর্ত লাগাতে পারবে না। এ মাস'আলায় কোন কোন ফিকাহ্বিদ ভিন্ন মতও পোষণ করেন। বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহ্ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় আয়াতে গুহায় নিদ্রার সময়কাল তিন শত বছর বলা হয়েছে। কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে বাহ্যত এ কথাই বোঝা যায় যে, এই সময়কাল আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীরের মতে এটাই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিক-সংখ্যক তফসীরবিদদের উক্তি। আবূ হাইয়্যান, কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদও তাই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হযরত কাতাদাহ প্রমুখ থেকে এ সম্পর্কে আরও একটি উক্তি বর্ণিত আছে। তা এই যে, তিন শত বছরের সময়কালের উক্তিটিও উপরোক্ত মতভেদ-কারীদের কারও কারও পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার উক্তি হচ্ছে শুধু اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا বাক্যটি। কেননা, তিন শত নয় বছর নির্দিষ্ট করার কথাটি যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়, তবে পরে اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا বলার কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদরা বলেন যে, উভয় বাক্যই আল্লাহ্ তা'আলার কালাম প্রথম বাক্যে বাস্তব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্যে এর সাথে বিরোধ পোষণকারীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সময়কাল বর্ণিত হয়ে গেছে তখন একে মেনে নেয়া অপরিহার্য। তিনিই জানেন। নিছক অনুমান ও মতামতের ভিত্তিতে এর বিরোধিতা করা নির্বুদ্ধিতা।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাক সময়কাল বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথমে তিন শত বছর বর্ণনা করেছে। এরপর বলেছে যে, এই তিন শতের উপর আরও নয় বেশি। প্রথমেই তিন শত নয় বলেনি কেন? তফসীরবিদগণ এর কারণ লিখেছেন যে, ইহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যে সৌর বর্ষের প্রচলন ছিল। এই হিসাবে মোট তিন শত বছরই হয়। ইসলামে চান্দ্র-বর্ষ প্রচলিত। চান্দ্র বর্ষের হিসাবে প্রতি একশত বছরে তিন বছর বেড়ে যায়। তাই তিন শত সৌর বছরে চান্দ্র বছর হিসাবে তিন শত নয় বছর হয়। এই দুই প্রকার বর্ষপঞ্জীর পার্থক্য বোঝাবার জন্য উপরোক্ত ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে আরও একটি প্রশ্ন হয় যে, আসহাবে কাহ্‌ফের ব্যাপারে স্বয়ং তাদের আমলে, অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যুগে ইহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যে দু'টি বিষয়ে মতভেদ ছিল। এক. আসহাবে কাহ্‌ফের সংখ্যা এবং দুই. গুহায় তাদের নিদ্রার সময়কাল। কোরআন পাক উভয় বিষয় একটু পার্থক্য সহকারে বর্ণনা করেছে। সংখ্যার বর্ণনা পরিষ্কার ভাষায় করেনি—ইঙ্গিতে করেছে। অর্থাৎ যে উক্তিটি নির্ভুল ছিল, তার খণ্ডন করেনি। কিন্তু সময়কাল পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে বলেছে ঃ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا—কারণ এই যে, এই বর্ণনা পদ্ধতির মাধ্যমে কোরআন একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। তা এই যে, সংখ্যার আলোচনা একেবারেই অনর্থক। এর সাথে কোন পার্থিব ও ধর্মীয় মাস'আলার সম্পর্ক নেই। তবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানবীয় অভ্যাসের বিরুদ্ধে নিদ্রামগ্ন থাকা এবং পানাহার ছাড়া সুস্থ ও সবল থাকা এরপর দীর্ঘ দিন পর সুস্থ অবস্থায় উঠে বসা—এগুলোর হাশর ও নশরের দৃষ্টান্ত এবং কিয়ামত ও পরকালের প্রমাণ হতে পারে তাই বিষয়টিকে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

যেসব লোক মু'জিযা ও অভ্যাস বিরোধী ঘটনাবলী অস্বীকার করে, না হয় প্রাচ্য-শিক্ষা বিশারদ পাশ্চাত্যের ইহুদী ও খৃস্টান লেখক কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তিতে ভীত হয়ে এগুলোতে নানা ধরনের সদর্থ বর্ণনা করার প্রয়াস পায়; তারা আলোচ্য আয়াতেও হযরত কাতাদাহ্‌র তফসীর অবলম্বন করে তিন শত নয় বছরের সময়কাল তৎকালীন লোকদের উক্তি সাব্যস্ত করে খণ্ডন করার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু তারা এ বিষয়ে চিন্তা করেনি যে, কাহিনীর শুরুতে سِنِينَ عَدَدًا বলা হয়েছে, তা আল্লাহ্ তা'আলার উক্তি ছাড়া কারও উক্তি হতে পারে না। অভ্যাসবিরুদ্ধ ঘটনা ও কিয়ামত প্রমাণ করার জন্য কয়েক বছর নিদ্রামগ্ন থেকে সুস্থ ও সবল অবস্থায় উঠে বসা যথেষ্ট। واللهُ اعلم

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ
وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ

يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ
عَيْنٰكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا
قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ وَقُلِ الْحَقُّ
مِنْ رَّبِّكُمْ ۟ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ اِنَّآ اَعْتَدْنَا
لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ
كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ۚ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾ اِنَّ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾
اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ
فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ
وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ ۚ وَحَسُنَتْ
مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

(২৭) আপনার প্রতি আপনার পালনকর্তার যে কিতাব প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে, তা পাঠ করুন। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। তাঁকে ব্যতীত আপনি কখনই কোন আশ্রয়ের স্থান পাবেন না। (২৮) আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং আপনি পৃথিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। (২৯) বলুনঃ 'সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক।' আমি জালিমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেওয়া হবে যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়! (৩০) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার

নষ্ট করি না। (৩১) তাদেরই জন্য আছে বসবাসের জান্নাত। তাদের পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। তাদের তথায় স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে এমতাবস্থায় যে, তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে। চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (আপনার কাজ এতটুকু যে) আপনার প্রতি আপনার পালনকর্তার যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তা (লোকদের সামনে) পাঠ করুন। (এর বেশি চিন্তা করবেন না যে, বড় লোকেরা যদি ইসলামের বিরোধিতা করতে থাকে, তবে ইসলামের উন্নতি কিভাবে হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং এর ওয়াদা করেছেন। এবং) তাঁর বাক্যকে (অর্থাৎ ওয়াদাসমূহকে) কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। (অর্থাৎ সারা বিশ্বের বিরোধিরা মিলেও আল্লাহ্‌কে ওয়াদা পূর্ণ করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না। আল্লাহ্ নিজে যদিও পরিবর্তন করতে সক্ষম, কিন্তু তিনি পরিবর্তন করবেন না।) এবং (যদি আপনি আল্লাহ্‌র বিধান বর্জন করে বড়লোকদের মনোরঞ্জন করেন, তবে) আপনি আল্লাহ্ ব্যতীত কখনই কোন আশ্রয়ের স্থান পাবেন না। (শরীয়তের প্রমাণাদির ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র বিধান বর্জন করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু এখানে তাকীদের জন্য অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে একথা বলা হয়েছে)। এবং (আপনাকে যেমন কাফিরদের ধনী ও বড়লোকদের দিক থেকে বেপরওয়া থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনি মুসলমান নিঃস্বদের অবস্থার প্রতি আরও মনোযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে আদেশ করা হচ্ছে। সুতরাং) আপনি নিজেকে তাদের সাথে (উঠাবসায়) আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সব সময়) তাদের পালনকর্তার ইবাদত শুধু তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে (কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে নয়) এবং পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে আপনি তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি (অর্থাৎ মনোযোগ) ফিরিয়ে নেবেন না। (পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে---অর্থ বড়লোকেরা মুসলমান হয়ে গেলে ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে ধন-সম্পদ দ্বারা ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় না, বরং আন্তরিকতা ও আনুগত্যের দ্বারা বৃদ্ধি পায়। দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যেও আন্তরিকতা ও আনুগত্য থাকলে তাতে ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। (গরীব মুসলমানদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্পর্কে) এরূপ ব্যক্তির আবদার মানবেন না, যার মনকে আমি (তার হঠকারিতার শাস্তিস্বরূপ) আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে রেখেছি। সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং তার এ অবস্থা (অর্থাৎ প্রবৃত্তির অনুসরণ) সীমা অতিক্রম করছে। আপনি (সে কাফির সরদারদেরকে বলে দিন ঃ (এ) সত্য (ধর্ম) তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক আর যার ইচ্ছা, কাফির থাকুক। (আমার কোন লাভ ক্ষতি নেই। লাভ ক্ষতি স্বয়ং তারই। তা এই যে) নিশ্চয় আমি জালিমদের জন্য (দোযখের) আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বলয় তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। (অর্থাৎ বলয়গুলোও আগুনের তৈরি। হাদীসে রয়েছে.

তারা এই বলয় অতিক্রম করতে পারবে না।) যদি তারা (পিপাসায় কাতর হয়ে) পানীয় প্রার্থনা করে, তবে এমন পানীয় দ্বারা তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করা হবে, যা (কুশ্রী হওয়ার দিক দিয়ে) তেলের গাদের মত হবে (এবং এত উত্তপ্ত হবে যে, কাছে আনতেই) মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। (ফলে মুখমণ্ডলের চামড়া উঠে যাবে। হাদীসে তাই বলা হয়েছে।) কতই না নিকৃষ্ট হবে সে পানীয় এবং কতই না মন্দ জায়গা হবে সে দোযখ। (এ হচ্ছে বিশ্বাস স্থাপন না করার ক্ষতি। এখন বিশ্বাস স্থাপন করার লাভ বর্ণিত হচ্ছে---) নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আমি সৎ কর্মীদের প্রতিদান নষ্ট করি না। এমন লোকদের জন্য সর্বদা বসবাসের বাগান রয়েছে। তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহর। তাদেরকে সেখানে স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ পরিধেয় পরিধান করবে (এবং) সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে উপবেশন করবে। কি চমৎকার প্রতিদান এবং (জান্নাত) কতই না উত্তম আশ্রয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দাওয়াত ও তাবলীগের বিশেষ রীতি ঃ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ এ আয়াতের শানে-নুযূল প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সবগুলোই আয়াত অবতরণের কারণ হতে পারে। বগভী বর্ণনা করেন, মক্কার সরদার ওয়ায়না ইবনে হিস্‌ন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দরবারে উপস্থিত হয়। তখন তাঁর কাছে হযরত সালমান ফারেসী (রা) উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র সাহাবীদের অন্যতম। তাঁর পোশাক ছিল এবং আকার-আকৃতি ফকীরের মত ছিল। তাঁর মত আরও কিছুসংখ্যক দরিদ্র ও নিঃস্ব সাহাবী মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। ওয়ায়না বলল ঃ এই লোকদের কারণেই আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না এবং আপনার কথা শুনতে পারি না। এমন ছিন্নমূল মানুষের কাছে আমরা বসতে পারি না। আপনি হয় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে রাখুন, না হয় আমাদের জন্য আলাদা এবং তাদের জন্য আলাদা মজলিস অনুষ্ঠান করুন।

ইবনে মরদুয়াইহ্, আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, উমাইয়া ইবনে খলফ জমহী রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পরামর্শ দেন যে, দরিদ্র, নিঃস্ব ও ছিন্নমূল মুসলমানদেরকে আপনি নিজের কাছে রাখবেন না, বরং কুরায়শ সরদারদেরকে সাথে রাখুন। এরা আপনার ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেলে ধর্মের খুব উন্নতি হবে।

এ ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়---এতে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। শুধু নিষেধই নয়---আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ---অর্থাৎ আপনি নিজেকে তাদের সাথে বেঁধে রাখুন। এর অর্থ এরূপ নয় যে, কোন সময় পৃথক হবেন না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সম্পর্ক ও মনোযোগ তাদের প্রতি নিবদ্ধ রাখুন। কাজে-কর্মে তাদের কাছ থেকেই পরামর্শ নিন।

এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, তারা সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র ইবাদত ও যিক্‌রে রত থাকে। তাদের কার্যকলাপ একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিবেদিত। এসব অবস্থা আল্লাহর সাহায্য ডেকে আনে। আল্লাহ্‌র সাহায্য তাদের জন্যই আগমন করে। ক্ষণস্থায়ী দুরবস্থা দেখে অস্থির হবেন না। পরিণামে সাহায্য ও বিজয় তারাই লাভ করবে।

কুরায়শ সরদারদের পরামর্শ কবুল না করার কারণও আয়াতের শেষে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের মন আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফিল এবং তাদের সমস্ত কার্যকলাপ তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসারী। এ সব অবস্থা মানুষকে আল্লাহ্‌র রহমত ও সাহায্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তাদের জন্য আলাদা মজলিস করার পরামর্শটি তো গ্রহণযোগ্য ছিল। এর ফলে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো এবং তাদের পক্ষে তা কবুল করা সহজ হত। কিন্তু এ ধরনের মজলিস বন্টনের মধ্যে অবাধ্য ধনীদের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখানো হত। ফলে দরিদ্র মুসলমানদের মন ভেঙ্গে যেত। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা তা পছন্দ করেন নি এবং এ ব্যাপারে পার্থক্য না করাকেই দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি স্থির করেছেন।

জান্নাতীদের অলংকার ঃ يُحَلَّوْنَ فِيهَا---এ আয়াতে জান্নাতী পুরুষদেরকেও স্বর্ণের কংকন পরিধান করানোর কথা বলা হয়েছে। এতে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অলংকার পরিধান করা পুরুষদের জন্য যেমন শোভনীয় নয়, তেমনি সৌন্দর্য ও সাজসজ্জাও নয়। তাদেরকে কংকন পরানো হলে তারা বিশ্রী হয়ে যাবে।

উত্তর এই যে, শোভা ও সৌন্দর্য প্রথা ও প্রচলনের অনুসারী। এক দেশে যাকে শোভা ও সৌন্দর্য মনে করা হয়, অন্য দেশে প্রায়ই তাকে ঘৃণার বস্তু বলে বিবেচনা করা হয়। এর বিপরীতও হয়ে থাকে। এমনিভাবে এক সময় কোন বিশেষ বস্তু সৌন্দর্য বলে বিবেচিত হয়, অন্য সময়ে তাকেই দোষ মনে করা হয়। জান্নাতে পুরুষদের জন্যও অলংকার এবং রেশমী বস্ত্র শোভা ও সৌন্দর্য সাব্যস্ত করা হলে তা কারও কাছে অপরিচিত ঠেকবে না। এটা শুধু দুনিয়ার আইন যে, এখানে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের কোন অলংকার এমনকি স্বর্ণের আংটি, ঘড়ির চেইন ইত্যাদিও ব্যবহার করা জায়েয নয়। এমনিভাবে রেশমী বস্ত্রও পুরুষদের জন্য জায়েয নয়। কিন্তু জান্নাত পৃথক এক জগত। সেখানে এ আইন থাকবে না।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ
وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۝ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ

أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾ وَّكَانَ لَهٗ
ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ
نَفَرًا ﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ
تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا ۙ ﴿٣٥﴾ وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ
اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ
وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ
نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ
بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ
لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٣٩﴾
فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا
حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا
غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ
كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ
يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴿٤٢﴾ وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿٤٣﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ
الْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾

(৩২) আপনি তাদের কাছে দু'ব্যক্তির উদাহরণ বর্ণনা করুন। আমি তাদের একজনকে দু'টি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছি এবং এ দু'টিকে খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছি এবং দু'-এর মাঝখানে করেছি শস্যক্ষেত্র। (৩৩) উভয় বাগানই ফলদান করে

এবং তা থেকে কিছুই হ্রাস করত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে আমি নহর প্রবাহিত করেছি। (৩৪) সে ফল পেল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সঙ্গীকে বলল ঃ আমার ধন-সম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী। (৩৫) নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল ঃ আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। (৩৬) এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যদি কখনও আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেওয়া হয়, তবে সেখানে এর চাইতে উৎকৃষ্ট পাব। (৩৭) তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসংগে বলল ঃ তুমি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে? (৩৮) কিন্তু আমি তো একথাই বলি, আল্লাহ্‌ই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার শরীক মানি না। (৩৯) যদি তুমি আমাকে ধনে ও সন্তানে তোমার চাইতে কম দেখ, তবে যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন একথা কেন বললে না; আল্লাহ্‌ যা চান, তাই হয়। আল্লাহ্‌র দেওয়া ব্যতীত কোন শক্তি নেই। (৪০) আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তার (তোমার বাগানের) উপর আসমান থেকে আগুন প্রেরণ করবেন। অতঃপর সকাল বেলায় তা পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে। (৪১) অথবা সকালে তার পানি শুকিয়ে যাবে। অতঃপর তুমি তা তালাশ করে আনতে পারবে না। (৪২) অতঃপর তার সব ফল ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল, তার জন্য সকালে হাত কচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল। বাগানটি কাঠসহ পুড়ে গিয়েছিল। সে বলতে লাগল ঃ হায়, আমি যদি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরীক না করতাম! (৪৩) আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোক হল না এবং সে নিজেও প্রতিকার করতে পারল না। (৪৪) এরূপ ক্ষেত্রে সব অধিকার সত্য আল্লাহ্‌র। তারই পুরস্কার উত্তম এবং তারই প্রদত্ত প্রতিদান শ্রেষ্ঠ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আপনি (দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা ও পরকালের স্থায়িত্ব প্রকাশ করার জন্য) দু'ব্যক্তির উদাহরণ (যাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল) বর্ণনা করুন (যাতে কাফিরদের ধারণা বাতিল হয়ে যায় এবং মুসলমানরা সান্ত্বনা লাভ করে)। তাদের এক-জনকে (যে ধর্মবিমুখ ছিল) আমি আঙ্গুরের দু'টি বাগান দিয়েছিলাম এবং এ দু'টিকে খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম এবং উভয় (বাগান) এর মাঝখানে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র। উভয় বাগান পুরোপুরি ফলদান করত এবং কোনটির ফলেই সামান্যও ত্রুটি হত না (সাধারণ বৃক্ষ এর বিপরীত। কোন সময় কোন বৃক্ষে এবং কোন বছর সব বৃক্ষে ফল কম আসে।) এবং উভয় বাগানের ফাঁকে ফাঁকে নহর প্রবাহিত করেছিলাম। তার কাছে আরও ধনসম্পদ ছিল। অতঃপর (একদিন) সে সঙ্গীকে কথা প্রসঙ্গে বলল ঃ আমার ধনসম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলেও আমি অধিক শক্তিশালী। (উদ্দেশ্য এই যে, তুমি আমার পথকে বাতিল এবং আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয় বলে থাক। এখন তুমি নিজেই

দেখে নাও যে, কে ভাল? তোমার দাবী সঠিক হলে ব্যাপার উল্টো হত। কেননা, শত্রুকে কেউ ধনৈশ্বর্য দান করে না এবং বন্ধুকে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত করে না।) এবং সে (সঙ্গীকে সাথে নিয়ে) নিজের উপর অপরাধ (কুফর) প্রতিষ্ঠিত করতে করতে বাগানে প্রবেশ করল (এবং) বলল ঃ আমি তো মনে করি না যে, এই বাগান (আমার জীবদ্দশায়) কখনও বরবাদ হয়ে যাবে। (এ থেকে বোঝা গেল যে, সে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তাঁর কুদরতে বিশ্বাসী ছিল না। শুধু বাহ্যিক হিফাযতের ব্যবস্থা দেখে সে একথা বলেছে)। এবং (এমনিভাবে) আমার মনে হয় না যে, কিয়ামত হবে এবং যদি (অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে) কিয়ামত হয়েই যায় এবং আমি আমার পালনকর্তার কাছে পৌঁছানো হই (যেমন, তুমি মনে কর) তবে অবশ্যই এ বাগানের চাইতে অনেক উত্তম জায়গা আমি পাব। কেননা, জান্নাতের জায়গা যে দুনিয়া থেকে উত্তম, তা তো তুমিও স্বীকার কর। একথাও তুমি স্বীকার কর যে, জান্নাত আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা পাবে। আমি যে প্রিয় এর লক্ষণাদি তো দুনিয়াতেই দেখতে পাচ্ছ। আমি আল্লাহ্‌র প্রিয় না হলে এমন বাগান কিরূপে পেতাম। তাই তোমার স্বীকারোক্তি অনুযায়ীও আমি সেখানে দুনিয়ার চাইতে উত্তম বাগান পাব। (তার এসব কথা শুনে) তার (দীনদার দরিদ্র) সঙ্গী বলল ঃ তুমি কি (তওহীদ ও কিয়ামত অস্বীকারের মাধ্যমে) তাকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে (প্রথমে) মাটি থেকে [হযরত আদম (আ)-এর মধ্যস্থতায়] সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (তোমাকে) বীর্য থেকে (মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেছেন এবং) অতঃপর তোমাকে সুস্থ-সবল মানুষ বানিয়েছেন? (এতদসত্ত্বেও তুমি যদি তওহীদ ও কিয়ামত অস্বীকার করতে চাও কর) কিন্তু আমি বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা এবং আমি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। (আল্লাহ্‌র একত্ব ও কুদরত যখন প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত তখন বাগানের উন্নতি ও হিফাযতের সব ব্যবস্থা যে কোন সময় অকেজো হয়ে বাগান ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই মহা ব্যবস্থাপক আল্লাহ্‌র প্রতি দৃষ্টি রাখাই তোমার উচিত ছিল।) তুমি যখন তোমার বাগানে পৌঁছেছিলে, তখন একথা কেন বললে না যে, আল্লাহ্ যা চান, তাই হয় (এবং) আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত (কারও) কোন শক্তি নেই। (যত দিন আল্লাহ্ চাইবেন, এ বাগান থাকবে এবং যখন চাইবেন ধ্বংস হয়ে যাবে)। যদি তুমি আমাকে ধনসম্পদ ও সন্তানে কম দেখ (যে কারণে তুমি নিজেকে প্রিয় মনে করছ), তবে আমি সে সময়টি নিকটবর্তী দেখছি, যখন আমার পালনকর্তা আমাকে তোমার বাগানের চাইতে উত্তম বাগান দেবেন (দুনিয়াতেই কিংবা পরকালে) এবং তার (অর্থাৎ তোমার বাগানের) উপর আসমান থেকে কোন নির্ধারিত বিপদ (অর্থাৎ সাধারণ কারণাদির মধ্যস্থতা ছাড়াই) প্রেরণ করবেন। ফলে বাগানটি হঠাৎ একটি পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে অথবা তার পানি (যা নহরে প্রবাহিত রয়েছে) সম্পূর্ণ নিম্নে (ভূগর্ভে) নেমে (শুকিয়ে) যাবে। অতঃপর তুমি (তা পুনর্বার আনার ও বের করার) চেষ্টাও করতে পারবে না। (এখানে ধার্মিক সঙ্গী অধার্মিকের বাগানের জওয়াব দিয়েছে), কিন্তু সন্তান সম্পর্কে কোন জওয়াব দেয়নি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, সন্তানের প্রাচুর্য তখনই সুখকর হয় যখন তাদের লালন-পালনের জন্য প্রচুর অর্থ-সম্পদও থাকে। অন্যথায় তা বিপদ বৈ নয়। এ বাক্যের সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে আল্লাহ্ তোমাকে

ধনৈশ্বর্য দান করেছেন, এটাই তোমার কুবিশ্বাসী হওয়ার কারণ। ধন-সম্পদকে তুমি আল্লাহ্‌র প্রিয় হওয়ার লক্ষণ মনে করে নিয়েছ এবং আমার ধন-সম্পদ নেই বলে তুমি আমাকে আল্লাহ্‌র অপ্রিয় মনে করছ। দুনিয়ার ধনদৌলতকে আল্লাহ্‌র প্রিয় হওয়ার ভিত্তি মনে করাটাই বড় ধোঁকা ও বিভ্রান্তি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার নিয়ামত সাপ, বিচ্ছু, ব্যাঘ্র ও দুষ্কর্মী সবাইকে দান করেন। পরকালের নিয়ামতই আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয় হওয়ার আসল মাপকাঠি। পরকালের নিয়ামত অক্ষয় এবং দুনিয়ার নিয়ামত ধ্বংসশীল) এবং (এই কথাবার্তার পর ঘটনা এই ঘটল যে) তার সব ধনসম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য হাত কচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল। বাগানটি কাঠামোসহ ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। সে বলতে লাগলঃ হায় আমি যদি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরীক না করতাম। (এ থেকে জানা গেল যে, বাগান ধ্বংস হওয়ার পর তার বুঝতে বাকী রইল না যে, কুফর ও শিরকের কারণেই এ বিপদ এসেছে। কুফর না করলে প্রথমত বোধ হয় এ বিপদই আসত না, আর এলেও তার প্রতিদান পরকালে পাওয়া যেত। এখন ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে শুধু ক্ষতিই ক্ষতি। কিন্তু এতটুকু আফসোস ও পরিতাপ দ্বারা তার ঈমান প্রমাণিত হয় না। কেননা এই পরিতাপ দুনিয়ার ক্ষতির কারণে হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্‌র তওহীদ ও কিয়ামতের স্বীকৃতি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে মু'মিন বলা যায় না।) এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন হল না (সে নিজের জনবল ও সন্তানাদির উপর গর্ব করত, তাও শেষ হল।) এবং সে নিজে (আমার কাছ থেকে) প্রতিশোধ নিতে পারল না। এরূপ ক্ষেত্রে সাহায্য করা একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌রই কাজ। (পরকালেও) তারই সওয়াব সর্বোত্তম এবং (দুনিয়াতেও) তাঁরই পুরস্কার সর্বশ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ প্রিয় বান্দাদের কোন ক্ষতি হয়ে গেলে উভয় জাহানে তার শুভ ফল পাওয়া যায়, কিন্তু কাফির পুরোপুরিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ثمر - وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ শব্দের অর্থ বৃক্ষের ফল এবং সাধারণ ধনসম্পদ। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ থেকে দ্বিতীয় অর্থ বর্ণিত হয়েছে। (ইবনে কাসীর) কামুস গ্রন্থে আছে, ثمر শব্দটি বৃক্ষের ফল এবং নানা রকমের ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ থেকে জানা যায় যে, লোকটির কাছে শুধু ফলের বাগান ও শস্যক্ষেত্রই ছিল না, বরং স্বর্ণ-রৌপ্য ও বিলাস-ব্যসনের যাবতীয় সাজসরঞ্জামও বিদ্যমান ছিল। স্বয়ং তার বাক্য, যা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا ও এ অর্থই বোঝায়।

مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ—শো'আবুল ঈমানে হযরত আনাসের রেওয়ায়েত ক্রমে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেনঃ কোন পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর যদি مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ বলে দেওয়া হয়, তবে কোন বস্তু তার ক্ষতি করতে

পারবে না। (অর্থাৎ পছন্দনীয় বস্তুটি নিরাপদ থাকবে) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু দেখে এই কলেমা পাঠ করলে তা 'চোখ লাগা' বা বদ নজর থেকে নিরাপদ থাকবে.

حُسْبَانًا ——হযরত কাতাদাহর মতে এর তফসীর আযাব। ইবনে আব্বাস এর অর্থ নিয়েছেন অগ্নি এবং কেউ কেউ অর্থ নিয়েছেন প্রস্তর বর্ষণ। أُحِيطَ بِثَمَرِهِ এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তার বাগান ও ধনসম্পদের উপর কোন নৈসর্গিক বিপদ পতিত হল। ফলে সব ধ্বংস হয়ে গেল। কোরআন পরিষ্কার ভাবে কোন বিশেষ বিপদের নামোল্লেখ করেনি। বাহ্যত বোঝা যায় যে, কোন নৈসর্গিক আগুন এসে সবগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস থেকেও حسبان শব্দের তফসীরে আগুনই বর্ণিত আছে। واللہ اعلم

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ
فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ۭ وَكَانَ
اللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝
وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ
مِنْهُمْ اَحَدًا ۝ وَعُرِضُوْا عَلٰي رَبِّكَ صَفًّا ۭ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا
خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۭ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ۝
وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ
وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا
كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۭ وَلَا يَظْلِمُ
رَبُّكَ اَحَدًا ۝

(৪৫) তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায় যা আমি আকাশ থেকে নাযিল করি। অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল-সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়, অতঃপর তা এমন শুষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ্ এ সবকিছুর উপর শক্তিমান। (৪৬) ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্য উত্তম। (৪৭) যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি মানুষকে একত্র করব অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না। (৪৮) তারা আপনার পালনকর্তার সামনে পেশ হবে সারি-বদ্ধভাবে এবং বলা হবেঃ তোমরা আমার কাছে এসে গেছ; যেমন তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম। না, তোমরা তো বলতে যে, আমি তোমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না। (৪৯) আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে; তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবেঃ হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা! এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি --- সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ইতিপূর্বে পার্থিব জীবন ও তার ক্ষণভঙ্গুরতা একটি ব্যক্তিগত উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছিল। এখন এ বিষয়টিই একটি সামগ্রিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে।) আপনি তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উদাহরণ বর্ণনা করুন; তা পানির ন্যায় যা আমি আকাশ থেকে নাযিল করি। অতঃপর এর (পানি) দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ খুব ঘন হয়ে উঠে। অতঃপর তা (সে সবুজ-শ্যামল ও তরতাজা হওয়ার পর শুকিয়ে) এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। (দুনিয়ার অবস্থাও তাই। আজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর দেখা গেলে কাল তার নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকবে না।) আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুর উপর শক্তিমান। (যখন ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন---উন্নতি দান করেন এবং যখন ইচ্ছা, ধ্বংস করে দেন। পার্থিব জীবনের যখন এই অবস্থা এবং) ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি (যখন) পার্থিব জীবনের শোভা (এবং তারাই আনুষঙ্গিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, তখন স্বয়ং ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি তো আরও বেশী দ্রুত ধ্বংসশীল হবে।) এবং স্থায়ী সৎ-কর্মসমূহ আপনার পরওয়ারদিগারের কাছে (অর্থাৎ পরকালে এ দুনিয়ার চাইতে) প্রতি-দানের দিক দিয়েও (হাজার গুণ) উত্তম এবং আশার দিক দিয়েও (হাজার গুণ) উত্তম। (অর্থাৎ সৎ কর্ম দ্বারা যেসব আশা করা হয়, সেগুলো পরকালে অবশ্যই পূর্ণ হবে এবং আশার চাইতেও বেশী সওয়াব পাওয়া যাবে। দুনিয়ার আসবাবপত্র এর বিপরীত। এর দ্বারা দুনিয়াতেও মানুষের আশা পূর্ণ হয় না এবং পরকালে তো আশা পূরণের কোন সম্ভাবনাই নেই।) সেদিনের কথা স্মরণ করা উচিত, যেদিন আমি পাহাড়গুলো (তাদের অবস্থান থেকে) সরিয়ে দেব (প্রথমে এরূপ হবে। তারপর পাহাড়গুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে

যাবে।) এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর (কেননা পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষলতা, ঘরবাড়ী ইত্যাদি কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না) এবং আমি সবাইকে (কবর থেকে উত্থিত করে হাশরের ময়দানে) সমবেত করব এবং (সেখানে না এনে) তাদের কাউকে ছাড়বে না। তারা সবাই আপনার পালনকর্তার সামনে (অর্থাৎ হিসাবের কাঠ-গড়ায়) সারিবদ্ধভাবে পেশ হবে (কেউ কারও আড়ালে আত্মগোপন করার সুযোগ পাবে না। তাদের মধ্যে যারা কিয়ামত অস্বীকার করত, তাদেরকে বলা হবে ঃ) দেখ শেষ পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে (পুনর্জন্ম লাভ করে) এসে গেছ; যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার (অর্থাৎ দুনিয়াতে) সৃষ্টি করেছিলাম (কিন্তু তোমরা প্রথম জন্ম দেখা সত্ত্বেও এ পুনর্জন্মে বিশ্বাসী হওনি) বরং তোমরা মনে করতে যে, আমি তোমাদের (পুনরায় সৃষ্টির জন্য) কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না। আর আমলনামা (ডান হাতে অথবা বাম হাতে দিয়ে তার সামনে) রেখে দেওয়া হবে, (যেমন ; অন্য এক আয়াতে আছে وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا) তখন আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন যে, তাতে যা কিছু (লিখিত) আছে, (তা দেখে) তার কারণে (অর্থাৎ তার শাস্তির কারণে) ভীত-সন্ত্রস্ত হচ্ছে। তারা বলবে ঃ হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা! এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি! তারা যা কিছু (দুনিয়াতে) করেছিল, সব (লিখিত আকারে) উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না। (যে করা হয়নি, এমন গোনাহ্ লিপিবদ্ধ করবেন অথবা শর্তাদিসহ যে সৎ কাজ করা হয়, তা লিপিবদ্ধ করবেন না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالْبَقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ—মসনদে আহ্মদ, ইবনে হাইয়্যান ও হাকিম হযরত আবূ সায়ীদ খুদরীর বাচনিক বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যত বেশী সম্ভব باقيات صالحات অর্জন কর। নিবেদন করা হল, باقيات صالحات কি? তিনি বললেন ঃ سُبْحَانَ اللهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ পাঠ করা। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

ওকায়লী নো'মান ইবনে বশীরের বাচনিক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এ উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ—এগুলোই হচ্ছে باقيات صالحات—এ বিষয়বস্তুই তাবারানী হযরত সা'দ ইবনে ওবাদার বাচনিক

বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিম ও তিরমিযী হযরত আবূ হুরায়রার বাচনিক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এ উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ কলেমাটি আমার কাছে সেসব বস্তুর চাইতে অধিক প্রিয়, যেগুলোর উপর সূর্যকিরণ পতিত হয় অর্থাৎ সারা বিশ্বের চাইতে।

হযরত জাবের বলেন ঃ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ কলেমাটি অধিক পরিমাণে পাঠ কর। কেননা, এটি রোগ ও কষ্টের নিরানব্বইটি অধ্যায় দূর করে দেয়। তন্মধ্যে সবচাইতে নিম্নস্তরের কষ্ট হচ্ছে চিন্তাভাবনা।

এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ শব্দটির তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরামা ও মুজাহিদ তাই করেছেন যে, এর দ্বারা উপরোক্ত কলেমাসমূহ পাঠ করা বোঝানো হয়েছে। সায়ীদ ইবনে জুবায়র, মসরূক ও ইবরাহীম বলেন যে, الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ -এর অর্থ পাঞ্জেগানা নামায।

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ বলে উপরোক্ত কলেমাসহ সাধারণ সৎ কর্ম বোঝানো হয়েছে---তা পাঞ্জেগানা নামাযই হোক অথবা অন্যান্য সৎ কর্ম হোক---সবই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত কাতাদাহ্ থেকে এ তফসীরই বর্ণিত হয়েছে---(মাযহারী)

এ তফসীর কোরআনের শব্দাবলীরও অনুকূল বটে। কেননা, الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ -এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে স্থায়ী সৎ কর্মসমূহ। বলাবাহুল্য সব সৎ কর্মই আল্লাহ্‌র কাছে স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত। ইবনে জরীর, তাবারী ও কুরতুবী এ তফসীরই পছন্দ করেছেন।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ শস্যক্ষেত্র দু'রকম ঃ দুনিয়ার ও পরকালের। দুনিয়ার শস্যক্ষেত্র হচ্ছে অর্থসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আর পরকালের শস্যক্ষেত্র হচ্ছে স্থায়ী সৎকর্মসমূহ। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ হচ্ছে মানুষের নিয়ত ও ইচ্ছা। এর উপরই সৎ কর্মসমূহের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভরশীল।

ওবায়দ ইবনে উমর বলেন ঃ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ হচ্ছে নেক কন্যা সন্তান। তারা পিতামাতার জন্য সর্ববৃহৎ সওয়াবের ভাণ্ডার। রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত হযরত আয়েশার এক রেওয়ায়েত এর সমর্থন করে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি উম্মতের এক ব্যক্তিকে দেখেছি, তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ হয়েছে। তখন তার নেক কন্যারা তাকে জড়িয়ে ধরল এবং কান্নাকাটি ও শোরগোল করতে লাগল।

তারা আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করল ঃ ইয়া আল্লাহ্, তিনি দুনিয়াতে আমাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের লালন-পালনে শ্রম স্বীকার করেছেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করে তাকে ক্ষমা করে দিলেন।---(কুরতুবী)

لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ---কিয়ামতের দিন সবাইকে বলা হবে ঃ আজ তোমরা এমনিভাবে খালি হাতে কোন আসবাবপত্র না নিয়ে আমার সামনে এসেছ, যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বাচনিক বর্ণিত রয়েছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) এক ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন ঃ লোকসকল, তোমরা কিয়ামতে তোমাদের পালনকর্তার সামনে খালি পায়ে, খালি শরীরে পায়ে হেঁটে উপস্থিত হবে। সেদিন সর্বপ্রথম যাকে পোশাক পরানো হবে, তিনি হবেন হযরত ইব্রাহীম (আ)। একথা শুনে হযরত আয়েশা প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্, সব নারী-পুরুষই কি উলঙ্গ হবে এবং একে অপরকে দেখবে? তিনি বললেন ঃ সেদিন প্রত্যেককেই এমন ব্যস্ততা ও চিন্তা ঘিরে রাখবে যে, কেউ কারও প্রতি দেখার সুযোগই পাবে না। সবারই দৃষ্টি থাকবে উপরের দিকে।

কুরতুবী বলেন ঃ এক হাদীসে বলা হয়েছে, মৃতরা বরযখে একে অপরের সাথে নিজ নিজ কাফন পরিহিত অবস্থায় মোলাকাত করবে। এই হাদীসটি উপরোক্ত হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা এ হাদীসে কবর ও বরযখের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, আর উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হাশরের ময়দানের অবস্থা। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, মৃত ব্যক্তি সে পোশাকেই হাশরের ময়দানে উত্থিত হবে, যাতে তাকে দাফন করা হয়েছিল। হযরত ওমর (রা) বলেন ঃ মৃতদেরকে ভাল কাফন দিয়ো। কেননা তারা কিয়ামতের দিন এ কাফন পরিহিত হয়েই উত্থিত হবে। কেউ কেউ এ হাদীসটিকে শহীদদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন। কেউ কেউ বলেন ঃ এটা সম্ভব যে, হাশরের ময়দানে কিছু লোক পোশাক পরিহিত অবস্থায় এবং কিছু লোক উলঙ্গ অবস্থায় উত্থিত হবে। এভাবে উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়। ---(মাযহারী)

কর্মানুযায়ী প্রতিদান ঃ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا---অর্থাৎ হাশরবাসীরা তাদের কৃতকর্মকে উপস্থিত পাবে। তফসীরবিদগণ এর অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করেন যে, নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদানকে উপস্থিত পাবে। শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র) বলতেন ঃ এরূপ অর্থ বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। বহু হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, এ সব কৃতকর্মই ইহকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির রূপ পরিগ্রহ করবে। তাদের আকার-আকৃতি সেখানে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সৎ কর্মসমূহ জান্নাতের নিয়ামতের আকার ধারণ করবে আর মন্দ কর্মসমূহ জাহান্নামের আগুন ও সাপ বিচ্ছু হয়ে যাবে।

হাদীসে আছে, যারা যাকাত দেয় না, তাদের মাল কবরে একটি বড় সাপের আকার ধারণ করে তাদেরকে দংশন করবে এবং বলবে انا مالك আমি তোমার মাল। সৎ কর্ম সুশ্রী মানুষের আকারে কবরের নিঃসঙ্গ অবস্থায় আতংক দূর করার জন্য আগমন করবে। কোরবানীর জন্তু পুলসিরাতের সওয়ারী হবে। মানুষের গোনাহ্ বোঝার আকারে প্রত্যেকের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে।

إِنَّمَا يَأْكُلُونَ কোরআনে ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের সম্পর্কে فِي بُطُونِهِمْ نَارًا বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা উদরে আগুন ভর্তি করছে। এসব আয়াত ও রেওয়ায়েতকে সাধারণত রূপক অর্থে ধরা হয়। উপরোক্ত বক্তব্য মেনে নিলে এগুলোতে রূপক অর্থের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সবগুলো আমল অর্থেই থাকে।

কোরআনে ইয়াতীমের অবৈধ অর্থসম্পদকে আগুন বলা হয়েছে। সত্য এই যে, তা এখনও আগুনই বটে, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া অনুভব করার জন্য এ জগত থেকে চলে যাওয়া শর্ত। উদাহরণত কেউ দিয়াশলাইর বাক্সকে আগুন বললে তা নির্ভুল হবে, কিন্তু এর দাহিকাশক্তি অনুভব করতে হলে ঘর্ষণ শর্ত। এমনিভাবে কেউ পেট্রোলকে আগুন মনে করলে তা শুদ্ধ হবে; তবে এর জন্য আগুনের সামান্যতম সংস্পর্শ শর্ত।

এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, মানুষ দুনিয়াতে সদাসৎ যেসব কর্ম করে; সেগুলোই পরকালে প্রতিদান ও শাস্তির রূপ ধারণ করবে। তখন এগুলোর প্রতিক্রিয়া ও আলামত এ দুনিয়া থেকে ভিন্নরূপ হবে।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ
كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ
أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۖ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ
بَدَلًا ﴿٥٠﴾ مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ
أَنفُسِهِمْ ۖ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥١﴾ وَيَوْمَ يَقُولُ
نَادُوا شُرَكَآءِىَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا
لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾ وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوٓا

أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا
فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْاِنْسَانُ
اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ
الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ
اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ
وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا
بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ﴿٥٦﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ
مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ
يَدٰهُ ۚ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ
وَقْرًا ۚ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ
الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ۭ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ
الْعَذَابَ ۭ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾
وَتِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ
مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾

(৫০) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ আদমকে সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা জালিমদের জন্য খুবই নিকৃষ্ট বদল। (৫১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজনকালে আমি তাদেরকে সাক্ষ্য রাখিনি এবং তাদের নিজেদের সৃজনকালেও না। এবং আমি এমনও নই যে, বিভ্রান্তকারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করব। (৫২) যে দিন তিনি বলবেন ঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক

মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা তখন তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা এ আহবানে সাড়া দেবে না। আমি তাদের মধ্যস্থলে রেখে দেব একটি মৃত্যু গহবর। (৫৩) অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝে নেবে যে, তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে এবং তারা তা থেকে রাস্তা পরিবর্তন করতে পারবে না। (৫৪) নিশ্চয় আমি এ কোরআনে মানুষকে নানাভাবে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বুঝিয়েছি। মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক তর্কপ্রিয়। (৫৫) হিদায়ত আসার পর এ প্রতীক্ষাই শুধু মানুষকে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বিরত রাখে যে, কখন আসবে তাদের কাছে পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অথবা কখন আসবে তাদের কাছে আযাব সামনাসামনি। (৫৬) আমি রসূলগণকে সুসংবাদ-দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপেই প্রেরণ করি এবং কাফিররাই মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং তারা আমার নিদর্শনাবলীও যদ্দ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়, সেগুলোকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছে। (৫৭) তার চাইতে অধিক জালিম কে, যাকে তার পালনকর্তার কালাম দারা বোঝানো হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার পূর্ববর্তী কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়? আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা রেখে দিয়েছি, যেন তা না বুঝে এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতার বোঝা। যদি আপনি তাদেরকে সৎ পথের প্রতি দাওয়াত দেন, তবে কখনই তারা সৎ পথে আসবে না। (৫৮) আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু; যদি তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করেন, তবে তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন, কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত সময়, যা থেকে তারা সরে যাওয়ার জায়গা পাবে না। (৫৯) এসব জনপদও তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা জালিম হয়ে গিয়েছিল এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্য একটি প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করেছিলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (সে সময়টিও স্মরণযোগ্য) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিলাম ঃ আদম (আ)-কে সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। (কেননা জিন সৃষ্টির প্রধান উপাদান হচ্ছে আগুন। অগ্নোপাদানের তাগিদ হল অনুগত না থাকা। কিন্তু এ উপাদানজনিত তাগিদের কারণে ইবলীসকে ক্ষমার্হ মনে করা হবে না। কারণ এ উপাদানজনিত তাগিদকে আল্লাহ্‌র ভয় দ্বারা পরাভূত করা সম্ভবপর ছিল।) অতএব এরপরও কি তোমরা তাকে এবং তার বংশধরকে (সন্তান-সন্ততি ও অনুসারীদেরকে) আমার পরিবর্তে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? (অর্থাৎ আমার আনুগত্য ত্যাগ করে তার কথামত চলছ)? অথচ সে (ইবলীস ও তার দলবল) তোমাদের শত্রু। (সর্বদাই তোমাদের ক্ষতি করার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে)। এটা অর্থাৎ ইবলীস ও (তার বংশধরের বন্ধুত্ব) জালিমদের জন্য খুবই মন্দ বদল। ('বদল' বলার কারণ এই যে, বন্ধু তো আমাকেই বানানো উচিত ছিল, কিন্তু তারা আমার বদলে শয়তানকে বন্ধু বানিয়েছে; বরং শুধু

বন্ধুই নয়, তাকে আল্লাহ্‌র শরীকও মেনে নিয়েছে। অথচ) আমি তাদেরকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির সময় (সাহায্য অথবা পরামর্শের জন্য) ডাকিনি এবং স্বয়ং তাদের সৃষ্টির সময়ও (ডাকিনি অর্থাৎ একজনকে পয়দা করার সময় অন্যজনকে ডাকিনি) এবং আমি এমন (অক্ষম) নই যে, (কাউকে বিশেষ করে) বিভ্রান্তকারীদেরকে (অর্থাৎ শয়তানদের) নিজ বাহুবল বানাব! (অর্থাৎ সাহায্যের প্রত্যাশী সে-ই হয়, যে নিজে শক্তিশালী ও সক্ষম নয়)। আর (তোমরা এখানে তাদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক মনে কর; কিয়ামতে আসল স্বরূপ জানা যাবে)। স্মরণ কর, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা (মুশরিক-দেরকে) বলবেন ঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে, তাদেরকে (সাহায্যের জন্য) আহবান কর। তারা তাদেরকে আহবান করবে, কিন্তু তারা জবাবই দেবে না। আমি তাদের মধ্যস্থলে একটি আড়াল করে দেব। (যাতে তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যায় নতুবা আড়াল ব্যতীতও তাদের সাহায্য করা সম্ভবপর ছিল না)। অপরাধীরা দোযখকে দেখবে, অতঃপর বিশ্বাস করবে যে, তাদেরকে তথায় পতিত হতে হবে এবং তারা তা থেকে পরিত্রাণের কোন পথ পাবে না। আমি এই কোরআনে মানুষের (হিদায়তের) জন্য সব রকম উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু নানাভাবে বর্ণনা করেছি। (এ সত্ত্বেও অবিশ্বাসী) মানুষ তর্কে সবার উপরে। (জিন ও জীবজন্তুর মধ্যে যদিও চেতনা ও অনুভূতি আছে, কিন্তু তারা এত তর্ক-বিতর্ক করে না)। হিদায়ত আসার পর (যার তাগিদ ছিল বিশ্বাস স্থাপন করা) মানুষকে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাদের পালনকর্তার কাছে (কুফর ও গোনাহ্‌র জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা করতে কোন কিছু বিরত রাখে না, কিন্তু এই প্রতীক্ষা যে, পূর্ববর্তী লোকদের (ধ্বংস ও আযাবের) রীতিনীতি তাদের কাছে আসুক অথবা তাদের কাছে আযাব সামনাসামনি আসুক। (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অবস্থা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তারা আযাবেরই অপেক্ষা করছে। নতুবা অন্য সব প্রমাণাদি তো পূর্ণ হয়ে গেছে।) আমি রসূলগণকে শুধু সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করি। (যার জন্য মু'জিযা ইত্যাদির মাধ্যমে যথেষ্ট প্রমাণাদি তাদের সাথে দেওয়া হয়। এর অতিরিক্ত কোন কিছু তাদের কাছে ফরমায়েশ করা মূর্খতা)। এবং কাফিররা মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে যাতে তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়। তারা আমার নিদর্শনাবলী এবং যদ্দ্বারা (অর্থাৎ যে আযাব দ্বারা) তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল, সেগুলোকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছে। তার চাইতে অধিক জালিম কে, যাকে তার পালনকর্তার কালাম দ্বারা বোঝানো হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজ হস্তদ্বয় দ্বারা যা কিছু (গোনাহ) সঞ্চয় করেছে, তাকে (অর্থাৎ তার পরিণামকে) ভুলে যায়? আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা রেখে দিয়েছি, যেন তা (অর্থাৎ সত্য বিষয় তারা) না বোঝে এবং (তা শোনা থেকে) তাদের কানে ছিপি এঁটে রেখেছি। (ফলে তাদের অবস্থা এই যে) আপনি যদি তাদেরকে সৎ পথের দিকে দাওয়াত দেন, তবে কখনই তারা সৎ পথে আসবে না। (কেননা তারা কানদিয়ে সত্যের দাওয়াত শোনে না, অন্তর দ্বারা বোঝে না। কাজেই আপনি চিন্তা করবেন না।) এবং (আযাবের বিলম্ব দেখে) তারা যে মনে করছে, আযাব আসবেই না, এর কারণ এই যে, আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু (তাই সময় দিয়ে রেখেছেন, যাতে তাদের চৈতন্যোদয় হয় ও বিশ্বাস স্থাপন করে, ফলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া

যায়। নতুবা তাদের কার্যকলাপ এমন যে) যদি তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করতেন, তবে তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন। (কিন্তু তিনি এরূপ করেন না)। তাদের (শাস্তির) জন্য একটি প্রতিশ্রুত সময় আছে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) যার এদিকে (অর্থাৎ পূর্বে) কোন আশ্রয়ের জায়গা পাবে না (অর্থাৎ সে সময়টি আসার আগে কোন আশ্রয়-স্থলে আত্মগোপন করে তা থেকে পরিত্রাণ পাবে না)। এবং (পূর্ববর্তী কাফিরদের ক্ষেত্রে এ রীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। সেমতে) এসব জনপদ (যাদের কাহিনী প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত), যখন তারা (অর্থাৎ এদের অধিবাসীরা) জালিম হয়ে গিয়েছিল, আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমি প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করে-ছিলাম। (এমনিভাবে বর্তমান লোকদের জন্যও সময় নির্দিষ্ট রয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইবলীসের সন্তান-সন্ততি ও বংশধরও আছে ঃ وَذُرِّيَّتَهُ—এ শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, শয়তানেরও সন্তান-সন্ততি ও বংশধর আছে। কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে ذُرِّيَّةٌ অর্থাৎ বংশধর বলে সাহায্যকারী দল বোঝানো হয়েছে। কাজেই শয়তানের ঔরসজাত সন্তানাদি হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু হুমায়দী রচিত 'কিতাবুল জমা বাইনাস সহীহাইন' গ্রন্থে হযরত সালমান ফারসীর রেওয়ায়েতে উল্লিখিত একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেন ঃ তুমি তাদের মধ্য থেকে হয়ো না যারা সবার আগে বাজারে প্রবেশ করে অথবা যারা সবার শেষে বাজার থেকে বের হয়। কেননা বাজার এমন জায়গা, যেখানে শয়তান ডিমবাচ্চা প্রসব করে রেখেছে! এ থেকে জানা যায় যে, ডিম থেকে শয়তানের বংশধর বৃদ্ধি পায়। এই হাদীসটি উদ্ধৃতি করে কুরতুবী বলেন ঃ শয়তানের যে সাহায্যকারী বাহিনী আছে, এ কথা তো অকাট্যরূপেই প্রমাণিত আছে ; ঔরসজাত সন্তান হওয়া সম্পর্কেও এ হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল।

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا—সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক তর্কপ্রিয়। এর সমর্থনে হযরত আনাস (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে ঃ রসূ-লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন কাফিরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে পেশ করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হবে ঃ আমার প্রেরিত রসূল সম্পর্কে তোমার কর্মপন্থা কেমন ছিল? সে বলবে ঃ পরওয়ারদিগার, আমি তো আপনার প্রতি, আপনার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম এবং তাঁদের আনুগত্য করেছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তোমার আমলনামা সামনে রাখা রয়েছে। এতে তো এমন কিছু নেই। লোকটি বলবে ঃ আমি এই আমলনামা মানি না। আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমার ফেরেশ-তারা তোমার দেখাশোনা করত। তারা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। লোকটি বলবে ঃ

আমি তাদের সাক্ষ্য মানি না। আমি তাদেরকে চিনি না এবং আমল করার সময় তাদেরকে দেখিনি। আল্লাহ্ বলবেন, সামনে লওহে-মাহফুয রয়েছে। এতেও তোমার অবস্থা এরূপই লিখিত রয়েছে। সে বলবে ঃ পরওয়ারদিগার, আপিনি আমাকে যুলুম থেকে আশ্রয় দিয়েছেন কি না? আল্লাহ্ বলবেন ঃ নিশ্চয় যুলুম থেকে তুমি আমার আশ্রয়ে রয়েছ। সে বলবে ঃ পরওয়ারদিগার, যেসব সাক্ষ্য আমি দেখিনি সেগুলো কিরূপে আমি মানতে পারি? আমার নিজের পক্ষ থেকে যে সাক্ষ্য হবে, আমি তাই মানতে পারি। তখন তার মুখ সীল করে দেওয়া হবে এবং তার হাত-পা তার কুফর ও শিরক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। এরপর তাকে মুক্ত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এই হাদীসের বিষয়বস্তু সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে।

وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِفَتٰىهُ لَآ أَبْرَحُ حَتّٰٓى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ
أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ
سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا
لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى
الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ ز وَمَآ أَنْسٰنِيهُ إِلَّا الشَّيْطٰنُ أَنْ
أَذْكُرَهُ ج وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ ج عَجَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا
نَبْغِ ج فَارْتَدَّا عَلٰٓى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا
ءَاتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ قَالَ
لَهُ مُوسٰى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلٰٓى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ
رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ
تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ
صَابِرًا وَّلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا
تَسْـَٔلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾

(৬০) যখন মসা তাঁর যুবক (সঙ্গী)-কে বললেনঃ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি আসব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। (৬১) অতঃপর যখন তাঁরা দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছালেন, তখন তাঁরা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলেন। অতঃপর মাছটি সমুদ্রে সুড়ঙ্গপথ সৃষ্টি করে নেমে গেল! (৬২) যখন তাঁরা সেস্থানটি অতিক্রম করে গেলেন, মূসা সঙ্গীকে বললেনঃ আমাদের নাশ্‌তা আন। আমরা এই সফরে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। (৬৩) সে বলল ঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন প্রস্তরখণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে একথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছে। (৬৪) মূসা বললেনঃ আমরা তো এ স্থানটিই খুঁজছিলাম। অতঃপর তারা নিজেদের চিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। (৬৫) অতঃপর তাঁরা আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একজনের সাক্ষাৎ পেলেন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছিলাম ও আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। (৬৬) মূসা তাঁকে বললেনঃ আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন? (৬৭) তিনি বললেনঃ আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। (৬৮) যে বিষয় বোঝা আপনার আয়ত্তাধীন নয়, তা দেখে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে? (৬৯) মূসা বললেনঃ আল্লাহ্‌ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না। (৭০) তিনি বললেনঃ যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং সে সময়টি স্মরণ কর, যখন মূসা (আ) নিজের খাদেমকে [তার নাম ছিল 'ইউশা' (বোখারী)] বললেনঃ আমি (এই সফরে) অনবরত চলতে থাকব, যে পর্যন্ত না সে স্থানে পৌঁছে যাই, যেখানে দুই সমুদ্র পরস্পর মিলিত হয়েছে, অথবা এমনিই যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। এই সফরের কারণ ছিল এই যে, একবার মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের সভায় ওয়ায করলে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলঃ বর্তমানে মানুষের মধ্যে সবচাইতে জ্ঞানী কে? তিনি বললেনঃ আমি। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভে যেসব জ্ঞান সহায়ক, সেগুলোতে আমার সমান কেউ নেই। এটা বলা নির্ভুল ছিল। কেননা তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার একজন মহানুভব পয়গম্বর ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর সমান কেউ জ্ঞানী ছিল না। কিন্তু বাহ্যত তাঁর এ ভাষার অর্থ দাঁড়ায় ব্যাপক। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে কথাবার্তায় সতর্কতা শিক্ষা দিতে চাইলেন। তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলা হলঃ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানের অধিকারী। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কতক বিষয়ে সে আপনার চাইতে

অধিক জ্ঞান রাখে, যদিও আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভে সেগুলো সহায়ক নয়। কিন্তু এর ভিত্তিতে জওয়াবে নিজকে 'অধিক জ্ঞানী' বলা উচিত হয়নি। একথা শুনে মূসা (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং তাঁর কাছে পৌঁছার উপায় জিজ্ঞেস করলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বললেনঃ একটি নিষ্প্রাণ মাছ সাথে নিয়ে সফর করুন। যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই আমার সে বান্দার সাক্ষাত পাবেন।

তখন মূসা (আ) 'ইউশা'-কে সাথে নেন এবং উপরোক্ত কথা বলেন। অতঃপর যখন (চলতে চলতে) তাঁরা দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছালেন, [তখন সেখানে একটি প্রস্তরখণ্ডে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। মাছটি আল্লাহ্‌র আদেশে জীবিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হল। 'ইউশা' জাগ্রত হয়ে মাছটি পেলেন না। ইচ্ছা ছিল, মূসা (আ) জাগ্রত হলে তাঁকে জানাবেন। কিন্তু একথা তাঁর মোটেই স্মরণ ছিল না। সম্ভবত পরিবার-পরিজন ও দেশের চিন্তা তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। নতুবা এমন আশ্চর্যজনক বিষয় ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি সদাসর্বদা মু'জিযা প্রত্যক্ষ করে, তার মন থেকে কোন চিন্তার কারণে নিম্নপর্যায়ের আশ্চর্যজনক বিষয় উধাও হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। মূসা (আ)-র জিজ্ঞেস করার সুযোগ হল না। এভাবে] তাঁরা তাঁদের মাছের কথা ভুলে গেলেন এবং মাছটি (ইতিপূর্বে জীবিত হয়ে) সমুদ্রে পথ করে চলে গেল। অতঃপর যখন তাঁরা (সেখান থেকে) সম্মুখে এগিয়ে গেলেন (এবং অনেক দূরে পৌঁছে গেলেন) তখন মূসা (আ) খাদেমকে বললেনঃ আমাদের নাশ্‌তা আন। আমরা এই সফরে (অর্থাৎ আজকের মনযিলে) অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। পূর্বেকার মনযিলসমূহে এত ক্লান্ত হইনি। এর কারণ বাহ্যত গন্তব্যস্থল অতিক্রম করে যাওয়া ছিল। খাদেম বলল ঃ আপনি লক্ষ্য করেছেন কি (যে, এক আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে গেছে), যখন আমরা প্রস্তরখণ্ডের নিকটে অবস্থান করছিলাম, (এবং ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তখন মাছটির একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। আমার ইচ্ছা ছিল আপনাকে জানাব, কিন্তু আমি অন্য চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম বলে) তখন মাছের (আলোচনার) কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে এ কথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। (ঘটনা এই যে) মাছটি জীবিত হওয়ার পর আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছে। (এক আশ্চর্যজনক বিষয় তো ছিল মাছটির জীবিত হওয়া। দ্বিতীয় আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল এই যে, মাছটি সমুদ্রে যে পথ দিয়ে চলেছিল, সেই পথের পানি অলৌকিকভাবে সুড়ঙ্গের মত হয়ে গিয়েছিল। পরে সম্ভবত সুড়ঙ্গ বন্ধ হয়ে গেছে।) মূসা [(আ) এ কাহিনী শুনে বললেন] আমরা তো এ স্থানটিই খুঁজছিলাম (সেখানেই ফিরে যাওয়া উচিত)। অতঃপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন দেখে দেখে ফিরে চললেন (সম্ভবত রাস্তাটি সড়ক ছিল না, তাই পায়ের চিহ্ন দেখতে হয়েছে)। অতঃপর (সেখানে পৌঁছে) তাঁরা আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের (অর্থাৎ খিযিরের) সাক্ষাত পেলেন, যাকে আমি বিশেষ রহমত (অর্থাৎ আমার সন্তুষ্টি) দান করেছিলাম (রহমতের অর্থ বেলায়েত ও নবুয়ত উভয়টি হওয়া সম্ভবপর) এবং আমার কাছ থেকে (অর্থাৎ উপার্জনের মাধ্যম ছাড়াই) শিখিয়েছিলাম বিশেষ জ্ঞান। [অর্থাৎ সৃষ্টিরহস্যের জ্ঞান। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে তা জানা যাবে। আল্লাহ্‌র নৈকট্য-

লাভে এই জ্ঞানের কোন প্রভাব নেই। যে জ্ঞান নৈকট্যলাভে সহায়ক, তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র রহস্যের জ্ঞান। এতে মূসা (আ) অগ্রণী ছিলেন। মোটকথা] মূসা [(আ) তাঁকে সালাম করলেন এবং তাঁকে] বললেন ঃ আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি (অর্থাৎ আমাকে আপনার সাথে থাকার অনুমতি দিন) এই শর্তে যে, যে উপকারী জ্ঞান আপনাকে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন? তিনি বললেন ঃ আপনি আমার সাথে থেকে (আমার ক্রিয়াকর্মে) ধৈর্য ধরতে পারবেন না (অর্থাৎ আপনি আমার কার্যকলাপের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা করবেন। শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যাপারে শিক্ষার্থী শিক্ষককে অনভিপ্রেত ও অসময়োচিতভাবে প্রশ্ন করলে তা অনধিকার চর্চা হয়ে পড়ে এবং ফলে সহঅবস্থান কঠিন হয়ে পড়ে)। এমন বিষয় সম্পর্কে (এরকম ব্যাপারে) আপনি কি করে ধৈর্য ধরবেন, যা আপনার জ্ঞানের আওতার বাইরে (অর্থাৎ কারণ জানা না থাকার কারণে বিষয়টি বাহ্যত শরীয়তবিরোধী মনে হবে। আপনি শরীয়তবিরোধী কাজে চুপ থাকতে পারবেন না।) মূসা (আ) বললেন ঃ (না) ইনশাআল্লাহ্‌ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল (অর্থাৎ সংযমী) পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না। (উদাহরণত বাধা দিতে নিষেধ করলে বাধা দেব না। এমনিভাবে অন্য কোন বিষয়েও বিরুদ্ধাচরণ করব না)। তিনি বললেন ঃ (আচ্ছা) যদি আপনি আমার সাথে থাকতে চান, তবে (লক্ষ্য রাখবেন যে) আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ—এ ঘটনায় 'মূসা' বলে প্রসিদ্ধ পয়গম্বর হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। নওফল বাক্কালী অন্য এক মূসার সাথে এ ঘটনাকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। সহীহ্‌ বোখারীতে হযরত ইবনে আব্বাসের পক্ষ থেকে তার তীব্র খণ্ডন বর্ণিত রয়েছে।

فَتٰى—এর শাব্দিক অর্থ যুবক। শব্দটিকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধ করা হলে অর্থ হয় খাদেম। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিশালী যুবক দেখে খাদেম রাখা হয়, যে সবরকম কাজ সম্পন্ন করতে পারে। ভৃত্য ও খাদেমকে যুবক বলে ডাকা একটি ইসলামী শিষ্টাচার। ইসলামের শিক্ষা এই যে, চাকরদেরকেও গোলাম অথবা চাকর বলে সম্বোধন করো না ; বরং ভাল খেতাব দ্বারা ডাক। এখানে فَتٰى শব্দটিকে মূসা (আ)-র দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তাই অর্থ হবে মূসা (আ)-র খাদেম। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, এই খাদেম ছিল ইউশা ইবনে নূন ইবনে ইফরায়ীম ইবনে ইউসুফ (আ)। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সে মূসা (আ)-র ভাগ্নেয় ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত ফয়সালা করা যায় না। সহীহ্‌ রেওয়ায়েতে প্রমাণিত রয়েছে যে, তার নাম ছিল ইউশা ইবনে নূন। অবশিষ্ট অবস্থার প্রমাণ নেই।---(কুরতুবী)

مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ—এর শাব্দিক অর্থ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল। বলা বাহুল্য, এ ধরনের স্থান দুনিয়াতে অসংখ্য আছে। এখানে কোন্ জায়গা বোঝানো হয়েছে, কোরআন ও হাদীসে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই ইঙ্গিত ও লক্ষণাদিদৃষ্টে তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কাতাদাহ্ বলেন ঃ পারস্য উপসাগর ও রোম সাগরের সঙ্গমস্থল বোঝানো হয়েছে। ইবনে আতিয়্যার মতে আজারবাইজানের নিকটে একটি স্থান, কেউ কেউ জর্দান নদী ও ভূমধ্যসাগরের মিলনস্থলের কথা বলেছেন। কেউ বলেন ঃ এ স্থানটি তুঞ্জায় অবস্থিত। ইবনে আবী হা'বের মতে এটি আফ্রিকায় অবস্থিত। সুদ্দীর মতে এটি আর্মেনিয়ায় অবস্থিত (অনেকের মতে বাহরে-আন্দালুসা ও বাহরে মুহীতের সঙ্গমস্থলই হচ্ছে এই স্থান। মোট-কথা, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে সে স্থানটি নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন।---(কুরতুবী)

হযরত মূসা (আ) ও খিযিরের কাহিনী ঃ সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমে হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়ায়েতে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ একদিন হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল ঃ সব মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? হযরত মূসা (আ)-র জানামতে তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিল না। তাই বলেন ঃ আমি সবার চাইতে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তাই এ জওয়াব তিনি পছন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দেয়াই ছিল আদব। অর্থাৎ একথা বলে দেয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন, কে অধিক জ্ঞানী। এ জওয়াবের কারণে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মূসা (আ)-কে তিরস্কার করে ওহী নাযিল হল যে, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী। [একথা শুনে মূসা (আ) প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি অধিক জ্ঞানী হলে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্য আমার সফর করা উচিত]। তাই বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্ আমাকে তাঁর ঠিকানা বলে দিন। আল্লাহ্ বললেন ঃ থলিয়ার মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নিন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের দিকে সফর করুন। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বান্দার সাক্ষাত পাবেন। মূসা (আ) নির্দেশমত থলিয়ায় একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর সাথে তাঁর খাদেম ইউশা ইবনে নূনও ছিল। পথিমধ্যে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর মাথা রেখে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলিয়া থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। (মাছের জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সাথে সাথে আরও একটি মু'জিযা এই প্রকাশ পেল যে) মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ্ তা'আলা সেই পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মত হয়ে গেল। ইউশা ইবনে নূন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা নিরীক্ষণ করেছিল। মূসা (আ) নিদ্রিত ছিলেন। যখন জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা ইবনে নূন মাছের এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তাঁর কাছে বলতে ভুলে গেলেন। এবং সেখান

থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলায় মূসা (আ) খাদেমকে বললেনঃ আমাদের নাশতা আন। এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ গন্তব্যস্থল অতিক্রম করার পূর্বে মূসা (আ) মোটেই ক্লান্ত হননি। নাশতা চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নূনের মাছের ঘটনা মনে পড়ল। সে ভুলে যাওয়ার ওযর পেশ করে বলল ঃ শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর বলল ঃ মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। তখন মূসা (আ) বললেনঃ সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল। (অর্থাৎ মাছের জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার স্থানটিই ছিল গন্তব্যস্থল)।

সেমতে তৎক্ষণাৎ তাঁরা ফিরে চললেন এবং স্থানটি পাওয়ার জন্যে পূর্বের পথ ধরেই চললেন। প্রস্তরখণ্ডের নিকট পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছে। মূসা (আ) তদবস্থায়ই সালাম করলে খিযির (আ) বললেন ঃ এই (জনমানবহীন) প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এল? মূসা (আ) বললেনঃ আমি মূসা। হযরত খিযির প্রশ্ন করলেনঃ বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি জওয়াব দিলেনঃ হ্যাঁ, আমি বনী ইসরাঈলের মূসা। আমি আপনার কাছ থেকে ঐ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত খিযির বললেনঃ আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। হে মূসা, আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক জ্ঞান দান করেছেন, যা আপনার কাছে নেই; পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আমি জানি না। মূসা (আ) বললেনঃ ইনশাআল্লাহ্, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোন কাজে আপনার বিরোধিতা করব না।

হযরত খিযির বললেনঃ যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই চান, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে তার স্বরূপ বলে দেই।

একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এসে গেলে তাঁরা নৌকায় আরোহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝিরা হযরত খিযিরকে চিনে ফেলল এবং কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় চড়েই খিযির কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে হযরত মূসা (আ) (স্থির থাকতে পারলেন না---) বললেনঃ তারা কোন প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন, যাতে সবাই ডুবে যায়? এতে আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। খিযির বললেনঃ আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। তখন মূসা (আ) ওযর পেশ করে বললেনঃ আমি আমার ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না।

রসূলুল্লাহ্ (সা) এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেনঃ হযরত মূসা (আ)-র প্রথম আপত্তি ভুলক্রমে, দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়েছিল (ইতিমধ্যে) একটি পাখী এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু

পানি তুলে নিল। খিযির মূসা (আ)-কে বললেন ঃ আমার জ্ঞান এবং আপনার জ্ঞান উভয়ে মিলে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের মুকাবিলায় এমন তুলনাও হয়না যেমনটি এ পাখীর চঞ্চুর পানির সাথে রয়েছে সমুদ্রের পানি।

অতঃপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কূল ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ খিযির একটি বালককে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করতে দেখলেন। খিযির স্বহস্তে বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। বালকটি মরে গেল। মূসা (আ) বললেন ঃ আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এ যে বিরাট গোনাহ্র কাজ করলেন! খিযির বললেন ঃ আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। মূসা (আ) দেখলেন, এ ব্যাপারটি পূর্বাপেক্ষা গুরুতর। তাই বললেন ঃ এরপর যদি কোন প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দেবেন। আমার ওযর-আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

অতঃপর আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। তারা সোজা অস্বীকার করে দিল। হযরত খিযির এই গ্রামে একটি প্রাচীরকে পতনোন্মুখ দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। মূসা (আ) বিস্মিত হয়ে বললেন ঃ আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করল অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ করে দিলেন; ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন! খিযির বললেন ঃ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ — অর্থাৎ এখন শর্ত পূর্ণ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়।

এরপর খিযির উপরোক্ত ঘটনাত্রয়ের স্বরূপ মূসা (আ)-র কাছে বর্ণনা করে বললেন ঃ ذٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا — অর্থাৎ এ হচ্ছে সে সব ঘটনার স্বরূপ; যেগুলো দেখে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেন নি। রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পূর্ণ ঘটনার বর্ণনা করে বললেন ঃ মূসা (আ) যদি আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেন, তবে তাদের আরও কিছু জানা যেত।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এই দীর্ঘ হাদীসে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে যে, মূসা বলতে বনী ইসরাঈলের পয়গম্বর মূসা (আ) এবং তাঁর যুবক সঙ্গীর নাম ইউশা ইবনে নূন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে যে বান্দার কাছে মূসা (আ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন খিযির (আ)। অতঃপর আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

সফরের কতিপয় আদব এবং পয়গম্বরসুলভ সংকল্পের একটি নমুনা ঃ

لَا أَبْرَحُ حَتّٰى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا — এ বাক্যটি হযরত মূসা (আ) তাঁর সফরসঙ্গী ইউশা ইবনে নূনকে বলেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সফরের দিক ও